# KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

| | |
|---|---|
| Record No. : KLMLGK 2007/ | Place of Publication : ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩ |
| Collection : KLMLGK | Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত |
| Title : সমকালীন (SAMAKALIN) | Size : 7" x 9.5"   17.78 x 24.13 c.m. |
| Vol. & Number ৫/-<br>৫/-<br>৫/- | Year of Publication : মাঘ, ১৩৬৪<br>ফাল্গুন, ১৩৬৪<br>চৈত্র, ১৩৬৪ |
| | Condition : Brittle / Good ✓ |
| Editor : সৌমেন্দ্র মজুমদার, আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত | Remarks : |

C.D. Roll No.: KLMLGK

আদর্শ পথ্য,
পানীয় ও খাদ্য




লিলি
বার্লি

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ
ও
স্বাস্থ্যপ্রদ

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত
লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪


# সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

= সম্পাদক =

= সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর = আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত =

পঞ্চম বর্ষ চৈত্র ১৩৬৪

# সমকালীন

পঞ্চম বর্ষ। চৈত্র। ১৩৬৪

॥ সূচীপত্র ॥

প্র ব ন্ধ ॥ স্বাধীনতা ও বিপ্লবের বন্ধু
আন্তর্জাতিক রামমোহন রায়। যোগানন্দ দাস ৭১৭
কালিদাসের কাব্যে ফুল। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭২৭
রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস। রথীন্দ্রনাথ রায় ৭৪৬
উ প ন্যা স ॥ এক ছিল কন্যা। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৪০
অ নু স্মৃ তি ॥ সান্নিধ্য। চিন্তামণি কর ৭৫২
আ লো চ না ॥ বৌদ্ধতন্ত্র ও চড়ক। রণজিৎকুমার সেন ৭৫৭
স মা জ স ম স্যা ॥ ভবিষ্যতের জন্য। সুব্রতেস ঘোষ ৭৬০
স মা লো চ না ॥ নাক নিয়ে নাকাল। বোরোবুদুরের ডাক।
সরিৎশেখর মজুমদার ৭৬২
ঝড় থামবে। কুশল মিত্র ৭৬৩

সম্পাদক

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

॥ দেশবিদেশের খবরের জন্যে ॥

**উইক্‌লী ওয়েস্ট বেঙ্গল**

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ও বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদপত্র। বার্ষিক ৬·০০ টাকা; ষান্মাসিক ৩·০০ টাকা।

**কথাবার্তা**

সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং সামাজিক ও অর্থ-নীতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩·০০ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

**বসুন্ধরা**

গ্রামীণ অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বাংলা মাসিকপত্র। বার্ষিক ২·০০ টাকা।

**শ্রমিক-বার্তা**

শ্রমিককল্যাণ সংক্রান্ত হিন্দি-বাংলা পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১·৫০ টাকা; ষান্মাসিক ০·৭৫ টাকা।

**পশ্চিম বংগাল**

নেপালী ভাষায় সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩·০০ টাকা ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

**মগরেবী বংগাল**

সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র উর্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩·০০ টাকা; ষান্মাসিক ১·০০ টাকা।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য**—(ক) চাঁদা অগ্রিম দেয়;
(খ) সবগুলিতেই বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়;
(গ) বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই;
(ঘ) ভি পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক নিচের ঠিকানায় লিখুন :
**প্রচার অধিকর্তা,**
**রাইটার্স বিল্ডিংস্,**
**কলিকাতা ১**




# স্বাধীনতা ও বিপ্লবের বন্ধু

## আন্তর্জাতিক রামমোহন রায়

**যোগানন্দ দাস**

"স্বাধীনতার শত্রু ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের মিত্রতা কোনদিন জয়ী হয় নি এবং শেষ পর্যন্ত কোনদিন জয়ী হবেও না।"—রামমোহন রায়, ১৮২১।

গোড়ার কথা

আজকাল গত শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা অনেকেই অনেক ভাবে করছেন। করা দরকার, শুধু অতীত গৌরবের খাতিরে অতীতকে জানবার জন্য নয়, অতীতের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের পথ নির্দেশের জন্য।

সাধারণত, গত শতাব্দী সম্বন্ধে ইতিহাসকারেরা ডিরোজিওর শিষ্যদল বা 'ইয়ং বেঙ্গল্' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁদের বিপ্লবী আখ্যা দিয়ে থাকেন, এবং তাঁদের তুলনায় রামমোহন রায়কে বলেন 'আধা বিপ্লবী' অথবা একেবারেই বিপ্লবী নয়, এবং তাঁর 'সংস্কার' কাজগুলোকে 'হাফ্-মেজার' বা আধা-খেঁচড়া কাজ ব'লে নিন্দা করেন।

'বিপ্লবের' তুলাদণ্ডে রামমোহনের সঙ্গে সে-সময়ের 'ইয়ং বেঙ্গল্'কে ওজন করবার আগে, বিপ্লব বিষয়ে রামমোহন-চরিত্রের একটা মোটামুটি ধারণা না ক'রে নিতে পারলে, এ-বিষয়ে রামমোহন ও ইয়ং বেঙ্গল কাউকেই ঠিক ভাবে বোঝা যাবে না, এবং সে-সময়ের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় উভয়ের মধ্যে কোনো তুলনামূলক বিচার সম্ভব হবে না।

রামমোহন সম্বন্ধে তাঁর শিষ্য ও ঘনিষ্ঠ সহচর উইলিয়াম্ অ্যাডাম্ বলেছিলেন :

"He would be free or not be at all...Freedom was perhaps the strongest passion of the soul."

অর্থাৎ, "রামমোহন হয় স্বাধীন থাকবেন, নয় তাঁর অস্তিত্বই থাকবে না, এই ছিল রামমোহনের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। মনে হয়, তাঁর অন্তরে সকলের চেয়ে শক্তিশালী প্রবৃত্তি বা আবেগ ছিল স্বাধীনতা।"

এই কথা মনে রেখে এইবার একটি ব্যাপক আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রামমোহন-জীবনীর কয়েকটি সংকেত আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'ব।

রামমোহন ও যুগ-সন্ধি : রাজ্য—প্রাজ্য

রামমোহন রায়ের জন্ম ও জীবন-কাল (১৭৭২-১৮৮৩) পৃথিবীর ইতিহাসে একটি যুগ-পরিবর্তনের সময়। এই যুগ-সন্ধি কালে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় সামন্ত-তন্ত্রে, রাজ-

তন্ত্রে ও সাম্রাজ্য-মূলক উপনিবেশ-তন্ত্রে ভাঙন ধরেছে ও শুরু হচ্ছে প্রজাতন্ত্র ও জাতীয়তার যুগ। এক একটি **রাজ্যের** পতন হচ্ছে, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ভেঙে যাচ্ছে, তার জায়গায় জন্ম গ্রহণ করছে একটি বা একাধিক **প্রাজ্য** বা প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ( 'রিপাব্‌লিক্‌ )।

রামমোহন যখন বাংলার রাধানগরে জন্মাচ্ছেন ( ২২শে মে ), সেই সময়ে আমেরিকায় স্বাধীনতার যুদ্ধ (১৭৭২-১৭৮৩) আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে। যখন বাল্যকালে তিনি হিন্দী, উর্দু, আরবি, ফার্সি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা আয়ত্ত করছেন সেই সময়ের মধ্যেই ইংলন্ডের ঔপনিবেশিক অধীনতা সম্পূর্ণ ছিন্ন ক'রে স্বাধীন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করেছে।

যখন তিনি ধর্ম বিষয়ে মতভেদের জন্য বাড়ী থেকে বিতাড়িত হ'য়ে সুদূর তিব্বতে পাড়ি দিচ্ছেন, সেই সময়ে ফরাসী বিপ্লবের প্রথম পর্ব (১৭৮৯-৯৯) আরম্ভ হচ্ছে।

ব্রিটিশ ভারতের ভিতরে ও বাইরে নানা জায়গায় ভ্রমণ শেষ ক'রে এবং সংস্কৃত হিন্দী উর্দু আরবি ও ফার্সী এই পাঁচটি ভাষায় দখল নিয়ে রামমোহন রায় যখন রংপুরে এসে ডিগ্‌বির অধীনে চাকরি গ্রহণ ক'রে ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় পূর্ণ মনোনিবেশ করছেন, তখন ফরাসী বিপ্লবের প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছে।

রামমোহন বুঝেছেন, বর্তমানকে জানবার জন্য ও তাৎকালিক 'আধুনিক' জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোকে এক নূতন ভবিষ্য-ভারতকে জন্ম দেবার পক্ষে ফরাসীর দিন চ'লে যাচ্ছে, ইংরেজী ভাষার দিন এগিয়ে আসছে। সেই জন্য তখনকার দিনের রেওয়াজ অনুযায়ী মাত্র কতকগুলো কাজ চালানো গোছের ইংরেজী প্রতিশব্দ না শিখে, ধর্ম থেকে পলিটিক্‌স্‌ মায় ভূগোল পর্যন্ত সর্ব বিষয়ে সমসাময়িক দুনিয়ার সঙ্গে যোগরক্ষার জন্য, মাতৃভাষার জ্ঞানভাণ্ডার বাড়াবার জন্য এবং ইংরেজী ভাষায় ভারী ভারী বিষয়ে আলোচনার জন্য রীতিমতো ভাবে ইংরেজী শিখলেন। ( রামমোহনই সর্বপ্রথম ভারতীয় এবং সম্ভবত এশিয়াবাসী যিনি ইংরেজী ভাষায় ভারতবর্ষের মানচিত্র সহ এদেশের ভৌগলিক পরিচয় পাশ্চাত্য জাতির কাছে উপস্থিত করেন। )

এত ভালো ভাবে ইংরেজী শিখলেন যে, য়োরোপ থেকে যাঁরা নতুন এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতেন, তাঁরা রামমোহনের ইংরেজী জ্ঞান দেখে বিস্ময় প্রকাশ ক'রে গিয়েছেন। তখনকার ইংলন্ডের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী যিনি বয়সে রামমোহনের চেয়ে চব্বিশ বছরের বড়ো এবং যাঁর মাতৃভাষা ইংরেজী, সেই জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮...১৮৩২) বলেছিলেন, তাঁর ইচ্ছে করে যে, তিনি যেন রামমোহন রায়ের মতো ইংরেজী লিখতে পারেন।

যে জেরেমি বেন্থাম লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা; যিনি ইংরেজী ভাষায় 'ইণ্টার্ন্যাশন্যাল' শব্দ প্রথম শুরু ও চালু করে দেন; শস্তার ডাক, মণি অর্ডার, আদমসুমারি, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের রেজিষ্ট্রীকরণ প্রথা প্রভৃতি বিবিধ ব্যবস্থার জন্য আজকের ইংলন্ড যাঁর কাছে ঋণী; যে জেরেমি বেন্থাম আইন প্রণয়নকে বলতেন একটা অঙ্কশাস্ত্র ( পাটীগণিত ) এবং যিনি পৃথিবীর যে-কোনো দেশের জন্য আইন প্রণয়ন ('লেজিস্‌লেশন্‌') ক'রে দিতে চেয়েছিলেন; যাঁর আইন প্রণয়নের নীতি ফ্রান্স, ইংলন্ড, জার্মানী ও দক্ষিণ আমেরিকার বহু দেশকে প্রভাবিত করেছিল; যিনি ফ্রান্স, দক্ষিণ আমেরিকা, মিশর ও ভারতবর্ষের ধর্মীয় সামাজিক বা রাষ্ট্রিক প্রগতিশীল বা বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত এবং ইংলন্ডে ব'সেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মনীষীদের সঙ্গে যোগরক্ষা ক'রে চলতেন; এবং 'বেন্থামাইট্‌' বা বেন্থাম-পন্থী ব'লে সে-কালের ইংলন্ডে যাঁর একটি শিষ্যদলেরই সৃষ্টি হয়েছিল; সেই বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন প্রবীণ নেতা জেরেমি বেন্থাম রামমোহন রায়কে এতদূর শ্রদ্ধা করতেন ও ভালোবাসতেন যে, তাঁকে যে কেবল 'মানবতার কাজে প্রিয় সহকর্মী' ব'লে সম্বর্ধনা করেছিলেন তাই



নয়, "হিন্দু রামমোহন রায়" যাতে ব্রিটিশ্‌ পার্লামেন্টের সদস্য হ'তে পারেন তার জন্য, রামমোহন বিলেতে পেঁছবার কয়েক মাসের মধ্যেই, সাধারণ ভাবে একটি 'পার্লামেণ্টারি ক্যান্ডিডেট সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন।

সমসাময়িক চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে, এই সমিতি স্থাপিত হবার পর রামমোহনও পার্লামেণ্টে ঢুকবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর কোনো ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা মেটাবার জন্য নয়, ভবিষ্যতে ভারতীয়দের পক্ষে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ঢুকবার "পথ সুগম করবার জন্য।" তখনও দাদাভাই নৌরজী জন্মগ্রহণ করেন নি, যিনি এই ব্যাপারের পঞ্চাশ বছরেরও পরে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ঢোকেন এবং তাই নিয়ে এদেশে হৈচৈ প'ড়ে যায়।

যে-ভাবে ইংলন্ডের লর্ড-পরিবারের লোকদের কাছে, জনসাধারণের কাছে, এমন কি মিলের শ্রমিকদের কাছে, এক কথায় সর্ব শ্রেণীর ইংলন্ডবাসীর কাছে রামমোহন রায় শ্রদ্ধা ও সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর যে-ভাবে ইংলন্ডের গীর্জায় গীর্জায় তাঁর জন্য বিশেষ উপাসনা হয়েছিল, তার দ্বারা এবং অন্য কয়েকটি বিষয় থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর পক্ষে বিপুল ভোটাধিক্যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ঢোকা খুব সহজ ছিল, **যদি না তিনি ঠিক পরের বছরেই (অর্থাৎ পরবর্তী নির্বাচনের আগেই) মারা যেতেন।**

রামমোহনের মতো দিগ্‌বিজয়ী তর্ক-যোদ্ধা, স্বদেশ-প্রেমিক, স্বাধীনতার পূজারী, রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি আইন থেকে শুরু ক'রে ভূগোল ইতিহাস ধর্মতত্ত্ব পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে পণ্ডিত ও বিভিন্ন ভাষাবিৎ, সর্বোপরি ভারত সম্বন্ধে তখনকার ইংলন্ডের কাছে সব চেয়ে ওয়াকেবহাল ও বিশেষজ্ঞ ব'লে পরিগণিত রামমোহন যদি তখন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য হ'তেন, তবে অবিভক্ত ভাবে ভারতের স্বাধীনতা অনেক বৎসর এগিয়ে যেতো।

যাই হোক্‌, রামমোহন যখন ইংরেজীর মাধ্যমে দুনিয়ার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন, ও য়োরোপ আমেরিকার স্বেচ্ছাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীরা কি ভাবে স্বাধীনতা-সংগ্রাম করছে তার খবর নিচ্ছেন, সেই সময়ে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকাব্যাপী বিরাট্‌ স্পানিশ্‌ উপনিবেশ-সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরেছে।

১৮১৫ সালে যখন রামমোহন কলকাতায় এসে পাকাপাকি ভাবে বসবাস করতে শুরু করলেন, তার মধ্যে এই ভাঙন আরো এগিয়ে গিয়েছে। ১৮১১ সালের মধ্যেই প্যারাগুয়ে ও ভেনেজুয়েলায় স্বাধীনতা সংগ্রামের আগুন জ্ব'লে উঠেছে, এবং পরে তারা স্পানিশ্‌ সাম্রাজ্যের নাগপাশ ছিন্ন ক'রে স্বাধীন প্রাজ্য বা 'রিপাব্‌লিক্‌' ঘোষণা করেছে।

তার পরে, ১৮২১ সালে, স্বাধীন পানামা প্রাজ্যের জন্ম। এর পরেই, ১৮২২ সালের ৫ই জানুয়ারি জেনারেল্‌ বলিভারের নেতৃত্বে ( যাঁর নামে দক্ষিণ আমেরিকার 'বলিভিয়া' স্বাধীন প্রাজ্যের নামকরণ ) স্পেনের পাঁচটি উপনিবেশ স্বাধীন প্রাজ্য ঘোষণা করল ঃ গুয়াতেমালা, হণ্ডুরাস্‌, এল্‌ সাল্‌ভাডর্‌, কস্টারিকা ও নিকারাগুয়া। ১৮২৫ সালে বলিভিয়া ও ১৮২৮ সালে উরুগুয়ে স্বাধীন প্রাজ্য হ'ল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে, যে-বছর ইকুয়েডর স্বাধীন হ'ল, সেই বছরই উচ্চ বংশীয় ব্রাহ্মণ রামমোহন রায় ( বন্দ্যোপাধ্যায় ) স্মৃতি শাস্ত্রের কলিবর্জ্য সমুদ্রযাত্রার বিধান লঙ্ঘন ক'রে কালাপানি পার হ'য়ে বিলাত যাত্রা করলেন।

এই আন্তর্জাতিক জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় রামমোহনের জন্ম ও জীবন। এই বিরাট্‌ সংগ্রামী বসুন্ধরার ( ফ্রান্স্‌, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকা, স্পেনের কাদিজ্‌, ইতালির নেপ্‌ল্‌স্‌, আয়র্লণ্ড্‌ প্রভৃতি) বীর্যরসপূর্ণ স্তন্যপানে রামমোহনের পুষ্টি ও বৃদ্ধি। তাই রামমোহন চিরজীবন স্বাধীনতা-প্রাণ, বিপ্লবীর বন্ধু এবং সমগ্র এশিয়ায়

সর্ব প্রথম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বোধসম্পন্ন নব যুগের পথদ্রষ্টা ও পথ স্রষ্টা।

রামমোহন ও বিপ্লবী গুয়াতেমালা

১৮২৮ সালে জেরেমি বেন্থাম রামমোহন রায়কে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। তার ভাবার্থ হ'ল :

"মধ্য আমেরিকার শিক্ষাদাতা হ'ল গুয়াতেমালা। তুমি যেমন তোমার দেশের শিক্ষক, তেমনি সমগ্র মধ্য আমেরিকার মস্তিষ্কস্বরূপ গুয়াতেমালার যিনি শিক্ষক, তাঁর নাম দেল্ ভালে। তাঁর কথা যেমন তোমাকে লিখলাম, **তোমার কথাও তেমনি তাঁকে জানাব। তোমরা দু'জনে মনের দিক থেকে সমগোত্রীয় মানুষ** ("কিন্‌ড্রেড্ সোলস্") তুমি যদি তাঁকে কিছু জানাতে চাও; আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেই আমি খুব আনন্দের সঙ্গে তাঁর কাছে তোমার চিঠিপত্র পাঠিয়ে দেবো।"

রামমোহন যে-ভাবে চিঠি লিখতে, নিজের পুস্তিকা পাঠাতে এবং দেশ বিদেশে চিঠি লিখে ও স্বরচিত পুস্তিকা প্রচার ক'রে যোগাযোগ স্থাপন করতে ভালোবাসতেন, তাতে মনে হয় না যে, জেরেমি বেন্থামের মারফৎ গুয়াতেমালার চিন্তা-নেতা দেল্ ভালের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের এমন যেচে-নেমন্তন্ন হেলায় হারাবেন।

রামমোহনের পুস্তিকা প্রভৃতি প্রচারের ফলে তখনকার দিনের মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাজগতের উপর যে ভারতীয় চিন্তাধারার একটা গভীর প্রভাব পড়েছিল, একজন মার্কিণ মহিলা শ্রীমতী এড্রিয়েন্ মুর তাঁর অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য ও ব্যাপক গবেষণার ফলে সেই সিদ্ধান্ত করেছেন এবং এই গবেষণার জন্য মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করেছেন।

দেল্ ভালের সঙ্গে বেন্থামের মারফৎ রামমোহন পুস্তিকাদি পাঠিয়ে কোনো যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন কিনা, এবং যদি ক'রে থাকেন তবে তার ফলে গুয়াতেমালার তথা মধ্য আমেরিকার চিন্তারাজ্যেও ভারতীয় চিন্তাধারার কোনো ছাপ পড়েছিল কিনা; সেটি বিশেষভাবে অনুসন্ধানযোগ্য। যাই হোক্, এবার আরো কাছে, স্পেনে, আসা যাক্।

রামমোহন ও বিপ্লবী স্পেন্

স্পেনের কাদিজ প্রদেশের রাজধানী কাদিজ অতি প্রাচীন শহর,—খৃঃ পূঃ ১১৮০ সালের কাছাকাছি সময়ে ফিনিশীয়দের দ্বারা স্থাপিত। স্পানীয় বিপ্লবী স্বদেশপ্রেমিকদের ঘাঁটি এই কাদিজ্ ১৮১০ খৃঃ থেকে ১৮১২ খৃঃ পর্যন্ত ফরাসী সৈন্য অবরোধ ক'রে থাকে। ১৮১২ সালের ১৯শে মার্চ তারিখে এই অবরুদ্ধ বিপ্লবীরা স্বেচ্ছাচারী একতান্ত্রিক রাজার কাছ থেকে জোর ক'রে একটি সংবিধান ("কন্‌স্টিটিউশন্") আদায় করেন।

এই ঘটনার বিষয়ে ভারতবর্ষের পক্ষে উল্লেখযোগ্য হ'ল, এই বিপ্লবীরা স্পানিশ্ ভাষায় লেখা তাঁদের দেশের এই নব-অর্জিত জাতীয় সংবিধানের এক খণ্ড বিশেষ ভাবে উপহার পাঠালেন সারা ভারতের মধ্যে আর কাউকে নয়, "উদার, উচ্চমনা, জ্ঞানী ও পুণ্যচরিত্র ব্রাহ্মণ রামমোহন রায়"কে।

সারা ভারতে সেদিন রামমোহনকেই এই স্বদেশপ্রেমিক স্পেন্ দেশীয় বিপ্লবীরা তাঁদের **একমাত্র বন্ধু** ভেবেছিলেন।

এই বিপ্লবীদের সঙ্গে বিপ্লব-দরদী রামমোহনের যোগসূত্র কী, এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান প্রয়োজন।

স্পেনের প্রাক্তন উপনিবেশ গুয়াতেমালার জাতীয় ভাষা স্পানিশ্। যে-সময়ে গুয়াতেমালা স্পেনের ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল মোচনের সংগ্রাম করছিল, সে-সময়ে স্পেনের বিপ্লবীদের



সঙ্গে বিপ্লবী গুয়াতেমালার নেতাদের ও দেল্ ভালের সহানুভূতির যোগাযোগ থাকা খুব স্বাভাবিক। দেল্ ভালেকে জেরেমি বেন্থাম রামমোহন রায় সম্বন্ধে লিখেছিলেন সে-কথা বেন্থামের চিঠি থেকেই প্রমাণ হয়। সম্ভবত বেন্থাম মারফৎ স্পানিশ্-ভাষা-ভাষী বিপ্লবী দেল্ ভালের সঙ্গে রামমোহনের যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়েছিল। এই দেল্ ভালে মারফৎই কি কাদিজের দেশপ্রেমিক বিপ্লবীরা রামমোহন বিষয়ে ওয়াকেব্‌হাল্ হয়েছিলেন, যার জন্য তাঁরা স্পানিশ্ ভাষায় লেখা নিজেদের জাতীয় সংবিধান রামমোহনকে উপহার পাঠান?

স্পানিশ্ ভাষায় লেখা সমসাময়িক পুস্তক পুস্তিকা ও সমসাময়িক পত্রিকা প্রভৃতি সম্বন্ধে গুয়াতেমালার ও স্পেনের লাইব্রেরিগুলিতে অনুসন্ধান আবশ্যক, যেমন ক'রে শ্রীমতী এড্রিয়েন্ মুর রামমোহন-গবেষণার জন্য মার্কিণী লাইব্রেরিগুলি তন্ন তন্ন ক'রে ঘেঁটেছিলেন।

যাই হোক্, এই উপহার সম্পর্কে ধর্ম-ক্ষেত্রের বাইরে রামমোহনের একটি নূতন পরিচয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এবার ইতালি।

রামমোহন ও বিপ্লবী ইতালি

নেপ্‌ল্‌স্‌বাসীদের পরাজয়ের সংবাদে রামমোহন অত্যন্ত অবসন্ন হয়েছিলেন, সেদিনের তাঁর একটি বিশেষ কাজ নির্দিষ্ট তালিকা থেকে বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন, এবং তাঁর অন্যতম বন্ধু সিল্ক বাকিংহামকে লিখেছিলেন (১১ আগস্ট, ১৮২১) : "আমার মন য়োরোপের শেষ সংবাদে ভারাক্রান্ত। আমি তাদের সাধনাকে আমার সাধনা, তাদের শত্রুকে আমার শত্রু মনে করি। তবে, স্বাধীনতার শত্রু ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের ('ডেস্পটিজ্‌ম্') মিত্ররা কোনো দিন জয়ী হয় নি, শেষ পর্যন্ত কোনো দিন জয়ী হবেও না।"

এই ঘটনাটিকে রামমোহনের চরিতকারেরা তাঁর মানসিক উদারতার ও পৃথিবীব্যাপী স্বাধীনতাকামীদের প্রতি সহানুভূতির একটি নিদর্শনমাত্র হিসেবে উল্লেখ করেন। কিন্তু, শুধু সহানুভূতি নয়, এর মধ্যে আরও গভীরতর ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। এই তাৎপর্য বুঝতে গেলে এই নেপ্‌ল্‌স্‌বাসী কা'রা ছিলেন এবং রামমোহন কর্তৃক উল্লিখিত তাঁদের "সাধনা" কিসের সাধনা ছিল, সে-বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে হয়।

আধুনিক য়োরোপের পলিটিক্যাল্ গুপ্ত সমিতির (কোনো কোনো আদিম জাতির মধ্যে ধর্মীয় গুপ্ত সমিতির সন্ধান পাওয়া যায়) জন্ম নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টির পতনের পর থেকে। য়োরোপের বিভিন্ন দেশে পরাধীনতার ও স্বেচ্ছাতন্ত্রী শাসনের বিরুদ্ধে এই সব গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হ'তে লাগল।

প্রথম দিকের পাশ্চাত্য বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিগুলির অন্যতম ছিল ইতালির ইতিহাস-বিখ্যাত 'কার্বনারি', এক সময়ে যার সদস্য হয়েছিল ম্যাট্‌সিনি। এর সদস্য সংখ্যা দু'লক্ষ পর্যন্ত পেঁছেছিল, এবং কিছু পরিমাণে এটি আন্তর্জাতিকও ছিল, কারণ, ইংলণ্ডের কবি লর্ড বাইরন্ এবং ইতালির বাইরে অন্যান্য কোনো কোনো দেশের মনীষী এর সদস্য শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এঁদের ঘাঁটি ছিল নেপ্‌ল্‌স্, উদ্দেশ্য ছিল ইতালির স্বাধীনতা। এই গুপ্ত সমিতির বিপ্লবীদের নেতৃত্বেই নেপ্‌ল্‌স্‌বাসীরা ১৮২১ সালে অস্ট্রিয়ার দাসত্ব-শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে, এবং অস্ট্রিয়া রাশিয়া প্রুশিয়া প্রভৃতি দেশের সম্মিলিত রাজন্যবর্গের নির্দেশে অস্ট্রীয় সৈন্যবাহিনী নির্মম ভাবে এই বিদ্রোহকে দমন করে।

এই দমনের ফলে দু'জন বিপ্লবী নেতা মোরেলি ও সিল্‌ভাটির ফাঁসি হয়। আমাদের গুপ্ত সমিতি চালিত বোমা আন্দোলনের ক্ষুদিরাম বসু, সত্যেন বসু প্রভৃতি যেমন ব্রিটিশ ভারতের প্রথম শহীদের দল, মোরেলি ও সিল্‌ভাটিও তেমনি অস্ট্রীয় ইতালির প্রথম শহীদের দল।

বিপ্লবী গুপ্তসমিতি 'কার্বনারি'-চালিত এই বিপ্লব নেপ্‌ল্‌স্‌বাসীদের এই স্বাধীনতা অর্জনের সাধনা বিপ্লবের সাধনা—ব্যর্থ হওয়াতেই রামমোহন গভীর অবসাদগ্রস্ত হ'ন ও বলেন, "তাদের সাধনা আমারও সাধনা, তাদের শত্রু আমারও শত্রু।" রামমোহন রায়ের সাধনা শুধু 'ধর্ম'-সাধনা ছিল না।

এই ঘটনায় রামমোহন রায় এতটা আঘাত পান যে ঐ চিঠিতেই বল্‌ছেন ঃ

"I am obliged to conclude that I shall not live to see liberty universally restored to the nations of Europe, and *the Asiatic nations, specially those that are European colonies.*" (Italics mine).

অর্থাৎ, "বাধ্য হ'য়ে আমাকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হচ্ছে যে, য়োরোপের দেশ, এবং **এশিয়ার দেশগুলিও, বিশেষ ক'রে যেগুলি য়োরোপের উপনিবেশ,** সেগুলি তাদের স্বাধীনতা ফিরে পাবে, এ জিনিষটি আমি আর দেখে যেতে পারব না।"

এই খেদোক্তির মধ্যে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার আছে। "এশিয়ার দেশগুলি, বিশেষ ক'রে যেগুলি য়োরোপের উপনিবেশ" এই কথার দ্বারা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, রামমোহন রায় **তাঁর জীবিতকালের মধ্যেই** ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখে যাবার আশা গভীর ভাবে পোষণ করতেন। এবং তিনি নিছক আশাবাদী ছিলেন না, অত্যন্ত রকম বাস্তব বোধসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। সুতরাং ধর্ম থেকে আরম্ভ ক'রে সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি তাঁর যাবতীয় সংস্কার কাজই **তাঁর ভারতের স্বাধীনতা-কামনার পরিপ্রেক্ষিতে** দেখা দরকার। "Freedom was perhaps the strongest passion of his soul."

এবার ইতালিতে ফিরে যাওয়া যাক্।

রামমোহন-শতবার্ষিকী (১৯৩৩) উপলক্ষে একজন ইতালীয় অধ্যাপক ডাঃ রিয়ার্ডো বলেন যে, "বর্বরোচিত" ভাবে কার্বনারি-চালিত নেপ্‌ল্‌সের বিদ্রোহ দমন করা হয়, ঠিক সেই সময়েই রাজা রামমোহন রায়ের **"একক"** কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল, আমি নেপ্‌ল্‌স্‌বাসীদের সাধনাকে "আমার নিজের সাধনা ব'লে মনে করি, তাদের শত্রু আমারও শত্রু।" এই কথা ব'লে ডাঃ রিয়ার্ডো ঘোষণা করেন, "আজকের ইতালি রাজা রামমোহন রায়ের নামকে **মোরেলি ও সিল্‌ভাচির একই পর্যায়ভুক্ত করে** তাঁর স্মৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।"

মনে রাখতে হবে, সেদিন (১৮২১) রামমোহন কণ্ঠ ছিল এ বিষয়ে "একক" কণ্ঠ ("সলিটারি ভয়েস্"), অর্থাৎ সারা দুনিয়ায়—য়োরোপ ও আমেরিকাতে দ্বিতীয় কোনো মানুষের সাহস হয় নি, ঐ গুপ্ত সমিতির বিদ্রোহের সঙ্গে, পরাধীন নেপ্‌ল্‌স্‌বাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করার। তখন ডিরোজিও অথবা ডিরোজিওর "বিপ্লবী" শিষ্যেরা কোথায়?

ইতালির বাইরে বিদেশী ইংলণ্ডের লর্ড বাইরন্ ও অন্যান্য কোনো কোনো দেশের কোনো কোনো মনীষী এই গুপ্ত সমিতির সদস্য ছিলেন আগেই বলেছি। রামমোহনের সঙ্গেও কি এর কোনো যোগাযোগ ছিল? এই সমিতির পুরানো কাগজপত্র ও তার নেতাদের চিঠিপত্রের সন্ধান পেলে সেগুলি দেখা দরকার।

রামমোহন ও বিপ্লবী ফ্রান্স্

ডিরোজিওর কাছে তাঁর ছাত্রদল ফরাসী বিপ্লবের কথা শুন্‌বার অনেক আগেই রামমোহন রায় তাঁর নিজ ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক বিদ্যালয়ে তাঁর নিজের ছাত্রদের জন্য পাঠ্য পুস্তক নির্ধারিত করেছিলেন ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম চিন্তানায়ক ভল্‌তেয়ারের বইয়ের



ইংরেজী অনুবাদ।

এদেশে থাকতেই তিনি তখনকার ইংলণ্ডে অবস্থিত ফরাসী বিপ্লবের অগ্রগামী চিন্তাধারার ধারক ও বাহক ইংরেজদের সঙ্গে চিঠিপত্রের মারফৎ যোগাযোগ করছেন।

ইংলণ্ডে যাত্রার সময়ে মাঝ সমুদ্রে ফরাসী জাহাজের দেখা পাওয়ায় জাহাজ থামিয়ে সেই ফরাসী জাহাজে গিয়ে ফরাসী-বিপ্লব-ভক্ত ও ভল্‌তেয়ার-ভক্ত রামমোহন রায় ফ্রান্সের বিপ্লবী তেরঙা পতাকাকে সশ্রদ্ধ সেলাম জানান এবং এই শ্রদ্ধা নিবেদনের উৎসাহের আবেগে সিঁড়ি থেকে প'ড়ে গিয়ে বাকী জীবন খোঁড়া হ'য়ে থাকেন।

শুধু তাই নয়। ফ্রান্সে যাবার আগ্রহ তাঁর এত বেশী ছিল যে, ইংলণ্ডে থাকা কালেই তিনি ফরাসী ভাষা শেখেন এবং ফ্রান্সে গিয়েছিলেন।

তিনি ফরাসী এশিয়াটিক্ সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অলস ভাবে শুধু নামকা ওয়াস্তে যুক্ত থাকার মানুষ রামমোহন রায় ছিলেন না। সুতরাং ঐ সোসাইটির নিকট তাঁর কোনো লেখা ('কন্‌ট্রিবিউশান্') আছে কিনা, যদি থাকে তবে সেগুলি কি বিষয়ে এবং কোন্ ভাষায় লেখা তার অনুসন্ধান হওয়া দরকার। বিলাতের এশিয়াটিক্ সোসাইটির অধিবেশনে রামমোহন যোগ দিয়েছিলেন তার রেকর্ড আছে। সেখানে তিনি প্রস্তাব উত্থাপনও করেছিলেন।

তিনি ফরাসী ভাষা কি বুঝাই শিখেছিলেন? ফরাসী ভাষায় তাঁর কোনো লেখা আছে কি না, সেই সময়কার ফরাসী পত্রিকাগুলি, ফ্রান্সের সরকারী দফ্‌তরখানা ও লাইব্রেরীগুলিতে অনুসন্ধান হওয়া দরকার।

ফ্রান্সে গিয়ে যখন তিনি ফ্রান্সের রাজা লুইয়ের সঙ্গে ভোজ করেন, তখন তাঁদের কথাবার্তার রেকর্ড কোথাও আছে কিনা? যদি থাকে, তবে তা থেকে বিপ্লবী ফ্রান্স সম্বন্ধে রামমোহনের চিন্তাধারার কিছু পরিচয় পাওয়া সম্ভব।

বিপ্লবী ফ্রান্স্ রামমোহনের কতখানি শ্রদ্ধার পাত্র ছিল, মাঝ সমুদ্রে পতাকা অভিবাদন ছাড়াও রামমোহনের বিদ্যালয়ে ভল্‌তেয়ারের বই পাঠ্য করাই তার প্রমাণ। হিন্দু কলেজেও ভল্‌তেয়ারের বই বা ফরাসী বিপ্লব কাহিনী পাঠ্য হিসেবে ঢোকে নি। সুতরাং এ-বিষয়ে ডিরোজিওর অনুপ্রেরণার উৎস রামমোহন কিনা, সে বিষয়ে অনুসন্ধান আবশ্যক।

পরবর্তী কালের কষ্টি পাথরে ফরাসী বিপ্লবের যে মূল্য নিরূপণই হয়ে থাকুক না কেন, সেই সময়ে কি চিন্তার ক্ষেত্রে কি রাষ্ট্রিক পরিবর্তনে ফরাসী বিপ্লব যে একটি বিরাট্ প্রগতিমূলক ব্যাপার ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিখ্যাত যুক্তিবাদী লেখক জোসেফ্ ম্যাক্‌কেব্ তাঁর 'সোশ্যাল্ রেকর্ড অফ্ ক্রিশ্চ্যানিটি' গ্রন্থে লিখেছেন যে, সে সময়ে ফরাসী বিপ্লবের প্রগতিশীল ভাবে ভাবুক সারা ইংলণ্ডে মাত্র ছয় সাত জন মানুষ ছিলেন। ফ্রান্সের গায়ের পাশে ইংলণ্ডের মতন দেশে যখন এই অবস্থা তখন সাত সমুদ্র তের নদী পারে সারা এশিয়ার মধ্যে একজন মানুষ রামমোহন রায়ের পক্ষে সেই ভাবের ভাবুক হওয়া ও ভল্‌তেয়ারের বই ছাত্রদের পাঠ্য করার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতখানি, যাঁদের সামান্যমাত্রও ইতিহাসবোধ আছে তাঁরাই বুঝবেন।

বাংলার পরবর্তী ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লবের "সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা" মন্ত্র যে গভীর রেখাপাত করেছিল তার মূলে রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন, ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যেরা ন'ন। বাংলা দেশে কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' প্রথম পত্রিকা যার শীর্ষদেশে মটো ছাপা থাকত, "সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা।"

রামমোহন ও বিপ্লবী আয়র্ল্যণ্ড

গত শতাব্দীর ভারতের ইতিহাসে নিপীড়িত ও বিপ্লবী আয়র্ল্যণ্ড দীর্ঘকাল ধরে—এমন কি বর্তমান শতকে স্বাধীন 'আয়ারের' জন্মকাল পর্যন্ত[১]—সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে বহু লেখক, কর্মী ও নেতা পর্যন্ত অনেককেই উদ্বুদ্ধ করেছে। বিপ্লবী আয়র্ল্যণ্ডের প্রতি ভারতবর্ষের এই যে সহানুভূতি ও সমবেদনা, সেই চেতনার সুদীর্ঘ ইতিহাসের আদি পুরুষ রাজা রামমোহন রায়।

নিপীড়িত নিষ্পেষিত বিপ্লবী আয়র্ল্যণ্ড বরাবর রামমোহনের অতি প্রিয় ছিল। আয়র্ল্যণ্ডের দুর্ভিক্ষে শুধু চাঁদা দিয়েই রামমোহন ক্ষান্ত হন নি, তাঁর জীবনীকার বলেন, সেই চাঁদার যে আবেদন-পত্র বা 'এ্যাপীল্' সেটিও রামমোহনেরই রচনা।

ইংলণ্ডে ইংরেজ প্রভৃতিদের কাছে চিঠিপত্র লেখবার সময়ে আয়র্ল্যণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা করতে রামমোহন রায় খুব ভালোবাসতেন।

শুধু তাই নয়। রামমোহনই সর্বপ্রথম ভারতীয় যিনি সমগ্র ভারতবর্ষের লোকদের কাছে আয়র্ল্যণ্ডের প্রতি ইংলণ্ডের অবিচার ও তার দরুণ আয়র্ল্যণ্ডের গভীর অসন্তোষের বার্তা তখনকার দিনের আন্তঃপ্রাদেশিক ফার্সি ভাষাতে ছাপা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচারিত তাঁর বিখ্যাত সংবাদপত্র 'মিরাৎ-উল্-আখ্‌বার' মারফৎ প্রচারিত করেন।

১৮২২, ১১ই অক্টোবরের 'মিরাৎ'এ "আয়র্ল্যণ্ডের বিপত্তি ও অসন্তোষ" শিরোনামায় রামমোহন একটি খুব কড়া প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধে কঠোর ভাষায় রামমোহন বলছেন : "ইংলণ্ডের রাজারা ন্যায়-বিচারের প্রতি চোখ বুজে থাকেন, ও আয়র্ল্যণ্ডের জমিদারদের জমিদারী তাঁদের নিজেদের [ অর্থাৎ ইংলণ্ডের রাজাদের ] পরগাছাদের ('প্যারাসাইট্‌স্') দান করেন।" তা ছাড়া ঐ প্রবন্ধে আরো বলেছেন যে, "আয়র্ল্যণ্ডের ক্যাথলিক্-ধর্মী জনসাধারণ ইংলণ্ডের সরকারী প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মে বিশ্বাস করে না। তা সত্ত্বেও আয়র্ল্যণ্ডের প্রোটেস্টাণ্ট পাদ্রীদের খরচ জোর করে আদায় করা হয় ক্যাথলিক্-ধর্মী জনসাধারণের ওপর ট্যাক্স চাপিয়ে।"[২]

এই লেখা প্রকাশের পর এখানকার ইংরেজ সরকার ফতোয়া দেন যে, কাগজ বার করবার আগে প্রত্যেকটি লেখা সরকারী দফতরখানায় পেশ করতে হবে। রামমোহন তাঁর কাগজ বন্ধ করে দিলেন, তবু আয়র্ল্যণ্ড বা অন্য যে-কোন বিষয় সম্বন্ধে তাঁর স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ হতে দিলেন না।

বিপ্লবী আয়র্ল্যণ্ডের প্রতি দরদ দেখাবার ফলেই রামমোহনের কাগজ বন্ধ হ'ল।

রামমোহন ও দাসত্ব-বিরোধী আমেরিকা

স্বাধীনতার ও বিপ্লবের বন্ধু এবং অত্যাচারী স্বেচ্ছাতন্ত্রের ('ডেস্পটিজ্‌ম্') ও দাসত্বের শত্রু হিসেবে রামমোহন রায়ের নাম তখন পৃথিবীতে কতখানি ছড়িয়ে পড়েছে, তার চমৎকার একটি পরিচয় পাওয়া যায় সুদূর আমেরিকার ওয়াশিংটন শহরে অনুষ্ঠিত ক্রীতদাস প্রথা বিরোধী মার্কিনী কংগ্রেসের ('আমেরিকান্ কংগ্রেস্ ফর্ দি এবলিশান্ অফ্ স্লেভারি') অধিবেশনে।

ঐ অধিবেশনে বক্তৃতা শেষ করবার সময়ে একজন প্রতিনিধি ('ডেলিগেট্') বলছেন :

"In closing this address, allow me to assume the name of *the most enlightened and benevolent of the human race* now living though not a white man,—Rammohun Roy." (Dr Kalidas Nag: "Rammohun and the New World," *Modern Review*, January 1953, p.55).



অর্থাৎ, "**আজ পৃথিবীতে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে যিনি সব চেয়ে বড়ো জ্ঞানী ও লোক হিতকারী,**—যদিও তিনি শ্বেতজাতির মানুষ নন,—সেই রামমোহন রায়ের নাম গ্রহণ করে এবং ( আমার নামের পরিবর্তে ) তাঁর নাম নিয়ে এই বক্তৃতা শেষ করতে আপনারা আমায় অনুমতি দিন।"

এ হ'ল ক্রীতদাস-প্রথার বিরোধ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আমেরিকার বিখ্যাত 'সিভিল্ ওয়ার' বা গৃহযুদ্ধের অনেক আগেকার ঘটনা।

সে-সময়ে য়োরোপ-আমেরিকায় ক্রীতদাস-প্রথা-বিরোধী সংগ্রামের নেতা ও ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত 'এণ্টি স্লেভারি সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ ইংরেজ নেতা উইলিয়াম্ উইল্‌বার্ফোর্সের (১৭৫৯-১৮৩৩) নাম সব চেয়ে বেশী।

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় হ'ল এই যে, একজন শ্বেতজাতির মানুষ, উক্ত মার্কিনী কংগ্রেসের প্রতিনিধি, য়োরোপ-আমেরিকার সম্মিলিত দাসত্ব-বিরোধী সংগ্রামে, স্বজাতীয় ( অর্থাৎ শ্বেতজাতীয়) সর্বজনমান্য এবং এ বিষয়ে সর্বজন স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ নেতা উইলিয়ম্ উইল্‌বার্ফোর্সের নাম গ্রহণ না করে, **নিজের ব্যক্তিত্ব মুছে দিয়ে,** ভারতীয় অ-শ্বেত জাতির নেতা রামমোহন রায়ের নাম গ্রহণ করতে গৌরব বোধ করছেন। মানুষের মুক্তি সংগ্রামে রামমোহন রায় কতখানি **আন্তর্জাতিক** স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন, এটি তার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

শেষের কথা

দেখা যাচ্ছে, শুধু ধর্ম বিষয়ে নয়, স্বাধীনতার বন্ধু এবং স্বেচ্ছাতন্ত্রের ও দাসত্বের শত্রু হিসেবে রামমোহন রায়ের নাম তাঁর জীবিতকালেই পৃথিবীর প্রান্ত সীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল আন্তর্জাতিক,—সকল জাতি, ধর্ম ও ভৌগলিক সীমানা ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিল।

বেন্থামের মতো মনীষী বলছেন, বিপ্লবী **গ্যুয়াতেমালার** শিক্ষক দেল্ ভালে আর ভারতের শিক্ষক রামমোহন একই শ্রেণীর মানুষ ( 'কন্‌ড্রেড্ সোল্‌স্' )।

**স্পেনের** বিপ্লবীরা তাঁদের সংগ্রাম-লব্ধ জাতীয় সংবিধান উপহার দিচ্ছেন রামমোহন রায়কে।

**ইতালি** রামমোহনকে স্থান দিচ্ছে তাদের বিপ্লবী শহীদ মোরেলি আর সিল্‌ভাটির সঙ্গে।

বিপ্লবী **ফ্রান্সের** পতাকাকে সেলাম জানাতে গিয়ে রামমোহন নিজের পা খোঁড়া করছেন ও বিপ্লবের অন্যতম চিন্তানায়কের বই পাঠ্য করছেন নিজের বিদ্যালয়ে।

অত্যাচারিত **আয়র্ল্যণ্ডের** প্রতি দরদ জানাতে গিয়ে রামমোহন নিজের **কাগজ বন্ধ** করে দিচ্ছেন।

**আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে** ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামী শ্বেতাঙ্গ সৈনিক লড়াই করছেন রামমোহন রায়ের নাম নিয়ে।

এবং **স্পানিশ্ আমেরিকার** একটি প্রাজ্ঞ স্বাধীন হওয়াতে আনন্দবিহ্বল রামমোহন রায় ঘটা করে বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করে নিজের খরচে প্রকাশ্য ভাবে কল্‌কাতার টাউন্ হলে (নিজের বাড়ীতে নয়) একটা 'পাব্‌লিক ফাংশান্' রূপে ভোজ দিচ্ছেন। সম্ভবত ঐ ভোজে হিন্দু কলেজের কোনো কোনো ছাত্র বা 'ইয়ং বেঙ্গল্' এমন কি স্বয়ং ডিরোজিও নিমন্ত্রিত হয়ে থাকবেন।

স্বাধীনতার ও বিপ্লবের বন্ধু রামমোহন রায়ের চরিত্রের এই **আন্তর্জাতিক** ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ডিরোজিও-শিষ্যদের "বিপ্লবের" আলোচনা করা উচিত। শুধু একটা কথা এখানে

উল্লেখ করা দরকার।

'ইয়ং বেঙ্গল্' দলের নেতা ছিলেন যে—তারাচাঁদ চক্রবর্তী, যাঁর নামে ঐ দল ইংরেজ মহলে পরিচিতি লাভ করেছিল ('চক্রবর্তী ফ্যাক্‌শন্'), সেই তারাচাঁদ চক্রবর্তী নিজে ছিলেন রামমোহন রায়ের একজন নিত্যসংগী ও শিষ্য এবং ডিরোজিওর 'একাডেমিক এসোসিয়েশন্' স্থাপিত হ'বার আগে থেকেই ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম সম্পাদক। "বিপ্লবী" ইয়ং বেঙ্গল্ দলের নেতা তারাচাঁদ চক্রবর্তী তাঁর "বিপ্লবের" পাঠ নিয়েছিলেন কার কাছে,—রামমোহন রায় না ভিভিয়ান্ ডিরোজিও।

---

১ আয়র্লণ্ডের সদ্য-লব্ধ স্বাধীনতাকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য সেই সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল হোম, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীরকুমার চৌধুরী, অশোক চট্টোপাধ্যায়, চারু রায়, হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বর্তমান লেখক প্রভৃতি সাহিত্যিকবৃন্দ চাংওয়াহ্ রেস্তঁরায় (তখন চীনাপাড়ায় অবস্থিত) একটি ভোজসভা ('সাব্‌স্‌ক্রিপ্‌শন্ ডিনার') করেন। সদ্য-স্বাধীন 'আয়ার'কে সম্বর্ধনা জানিয়ে একটি বাণী রচনা করেন কবি সত্যেন দত্ত ও ভোজসভায় সেটি পাঠ করেন কথা সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং ঐ বাণীটি টেলিগ্রাম ক'রে ডি, ভ্যালেরাকে পাঠানো হয়।

২ এই বিলাতী জিজিয়া করের রকমফের শুধু আয়র্লণ্ডে নয়, ব্রিটিশ ভারতেও ছিল। এর নাম ছিল 'এস্টাব্লিশ্‌মেণ্ট্ চার্জেস্।' ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরেও এটি ইংরেজ আমলে বরাবর ছিল। আংশিক স্বায়ত্তশাসনের পরেও এটি বড়লাট 'রিজার্ভড্ সাব্‌জেক্ট্'হিসেবে সদস্যদের ভোটের বাইরে নিজের হাতে রেখেছিলেন। আয়র্লণ্ডে যেমন ক্যাথলিক্ জনসাধারণের খাজনার টাকায় ইংলণ্ডের রাজধর্মী 'প্রোটেস্ট্যান্ট' পাদ্রী পোষা হত, ভারতবর্ষেও তেমনি এই খাতে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সর্ব ধর্মের লোকের খাজনাতে ইংলণ্ডের রাজধর্মী ক্রীশ্চান্ পাদ্রী পোষা হ'ত। রামমোহনের জীবত-কালেই রামমোহনের শিষ্য ও বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরের 'রিফর্মার' কাগজে (৩য় ভাগ, ১৩৪ সংখ্যা, ১৮ই আগস্ট, ১৮৩৩, পৃঃ ১) "গ্রাম সভা"র সভাপতি, সম্পাদিত ও দু'জন সভ্যের স্বাক্ষরে, এই বিষয়ে, "দি রাইট্ অনারেব্‌ল্ গভর্ণর জেনারেল্ লর্ড উইলিয়ম্ ক্যাবেণ্ডিশ্ বেণ্টিঙ্ক"কে সম্বোধন ক'রে একটি বিদ্রূপাত্মক চিঠি ছাপা হয়েছিল। সভাপতির নাম "গৌড়-কান্ত", সম্পাদকের নাম অলুকচন্দ্র শর্ম ("Olook Chander Shurmo") এবং সভ্যদ্বয়ের নাম ভটুমোহন দাস ও বাঁদরপ্রসাদ সেন ("Bonderprasand Sen") । নামগুলি দেখে মনে হয় সবকটিই ছদ্মনাম। ঐ চিঠির শেষ দিকে বড়লাটকে সাবধান ক'রে দেওয়া হয়েছেঃ

"Beware however that in case of a refusal we shall probably remain silent at present without making any complaint whatever, but the time is fast approaching, when we shall demand what we now only request to have. It is not very safe to trifle with the religion of millions of people while to encourage an irreligion (as we consider Christianity to be) from their own pockets..."

দ্বারকানাথ ঠাকুরের 'রিফর্মার' পত্রিকায় এই চিঠি ছাপা হবার প্রায় ২০ বছর পরে, ১৮৫৩ সালে এই 'এস্টাব্লিশ্‌মেণ্ট্ চার্জ্'-এর বিরুদ্ধে সম্পাদক (মহর্ষি) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বাক্ষরে ব্রিটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ পত্রিকাতেই, দেখা যায়, ১৮৮৩ সালেই "জমিন্দারী এসোসিয়েশন্" নামে একটি রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব ছাপা হয়েছে। 'রিফর্মার' কাগজে 'জমিন্দারী এসোসিয়েশন্' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ও এ-বিষয়ে আরো আলোচনা ছাপা হবার প্রায় তিন বছর পরে, দেখা যাচ্ছে, 'ধর্ম-সভার' এক অধিবেশনে রামকমল সেন কার্যত ধর্মসভা বাতিল ক'রে দিয়ে ঐ ধরণের সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করছেন যাতে "সকলের হিতজনক জমিদারী ও কৃষিকর্ম্মাদির আন্দোলন করা যায়।" (সমাচার দর্পণ ৩০ এপ্রিল, ১৮৩৬)। সুতরাং, এদেশে রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রথম প্রস্তাব, দেখা যাচ্ছে, দ্বারকানাথের দল থেকেই আসছে।

# কালিদাসের কাব্যে ফুল

**সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর**

## ঊনত্রিশ—কুমুদ

কুমুদের ভাগ্য ভালো। বিলাসিনীদের প্রসাধনের উপাদান না হয়েও সে মহাকবির সৌন্দর্য-দৃষ্টির প্রশংসা লাভ করতে পেরেছে। কবির দৃষ্টি হোলো শুদ্ধ দ্রষ্টার দৃষ্টি, ভোক্তার দৃষ্টি নয়। কবির কাছ থেকে কুমুদ সেই দৃষ্টির প্রসাদ লাভ করেছে। তার গৌরব তার প্রকাশের অনন্যতায়, তার স্বকীয় বিশেষত্বে। কুমুদের এই কদরে উজ্জয়িনীর বিলাসিনীরা হয়তো কবির উপর অভিমান করেছিলেন, কিন্তু তাদের উপেক্ষা করে কালিদাস সৌন্দর্য-লক্ষ্মী ও কাব্য-লক্ষ্মীর আশীর্বাদ নিঃসন্দেহে পেয়েছিলেন।

মেঘদূতম্-এর পূর্বমেঘে যক্ষ মেঘকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে অলকার পথে গম্ভীরা নদীর দেখা পাবে। সেই নদীর চাহনি শুভ্র কুমুদের মতো মনোহারী। সেই চটুল দৃষ্টির অসম্মান যেন না করে মেঘ। তারপরে কৈলাসে যখন পৌঁছবে তখন দেখবে শাদা কুমুদের মত সুন্দর তুষারেতে কৈলাস পর্বতের শিখরগুলি আবৃত। দুটি শ্লোকে এই বর্ণনা দুটি আছে ঃ—

গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নে
ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগা লপ্স্যতে তে প্রবেশম্।
তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন
ধৈর্য্যান্মোঘীকর্ত্তুং চটুলশফরোদ্বর্ত্তন প্রেক্ষিতানি ॥ ৪০ ॥

স্বচ্ছ পরাণ সম নির্মল গম্ভীরা নদী-জলে
মিষ্টস্বভাব হে মেঘ তোমার ছায়াখানি পাবে স্থান,
কুমুদ-শুভ্র চটুল দৃষ্টি দিয়ে নদী লীলাছলে
হেরিব তোমায়, সে দিঠির তুমি কোরোনা অসম্মান।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঃ গত্বা চোর্ধ্বং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধে
কৈলাসস্য ত্রিদশবণিতাদর্পনস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূত প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ ॥ ৫৮ ॥

রাবণ যাহারে নাড়া দিয়া জোরে দিয়াছিল বিয়াকুলি
অতিথি হইও সুরবালাদের দর্পণ সেই গিরি কৈলাসে তবে,
কুমুদের মতো সাদাতুষারেতে আবৃত শিখরগুলি
যেন শিবের অট্টহাস্য জমিয়া বিরাজিছে নীল নভে।

কুমারসম্ভবম্-এর সপ্তম সর্গে বিবাহ-সভায় গৌরীর সঙ্গে শিবের প্রথম দেখার এই মধুর ছবি আছে ঃ— তয়া প্রবৃদ্ধাননচন্দ্রকান্ত্যা প্রফুল্লচক্ষুকুমুদঃ কুমার্য্যা।
প্রসন্নচেতঃসলিলঃ শিবোহভূৎ সংসৃজ্যমানঃ শরদেব লোকঃ ॥ ৭৪ ॥

প্রফুল্লমুখী চন্দ্রকান্তি গৌরীর সাথে যবে
সাক্ষাৎ হোলো মহেশ্বরের বিবাহসভার মাঝে,

বিকশিত হোলো শিবের নয়ন শরৎ-কুমুদ সম,
শরতের নদী সম প্রাণ তাঁর সাজে আনন্দ-সাজে।

শিব পার্বতীকে চারদিকের দৃশ্য দেখিয়ে বলছেন :—

এতদুচ্ছ্বসিতপীতমৈন্দবং সোঢ়ুমক্ষমমিব প্রভারসম্।
মুক্তষট্পদবিরাবমঞ্জসা ভিদ্যতে কুমুদমা নিবন্ধনাৎ ॥ ৭০ ॥

এই কুমুদেরা চাঁদের কিরণ আকণ্ঠ করি পান
বে-সামাল হয়ে বৃন্ত অবধি ফুটিয়া উঠেছে তারা,
যে ভ্রমর ছিলো কুমুদ-কোরকে আবদ্ধ, হতমান,
মুক্তি লভিয়া করে গুঞ্জন আনন্দে দিশাহারা।

রাজকুমারী ইন্দুমতী স্বয়ংবৃতা। অজকে পতিরূপে বরণ করবার পর স্বয়ংবর সভায় আগত নৃপতিদের কি রকম অবস্থা হোলো তার বর্ণনা রঘুবংশম্-এর ষষ্ঠ সর্গে আছে :—

প্রমুদিতবরপক্ষমেকতস্তৎ ক্ষিতিপতিমণ্ডলমন্যতো বিতানম্।
উষসি সর ইব প্রফুল্ল-পদ্মং কুমুদবন প্রতিপন্ননিদ্রমাসীৎ ॥ ৮৬ ॥

প্রফুল্ল বরপক্ষীয় দল সভার একটি ধারে,
অন্য দিকেতে নীরস-বদন নৃপতিরা দলে দলে,
যেন প্রভাতের সায়র, পদ্ম বিকশিত এক দিকে,
ও ধারে কুমুদ সুপ্তিমগন শোভে সায়রের জলে।

নৃপতি কুশ মারা গেলেন। দুর্জয় দৈত্যকে বধ করলেন বটে কিন্তু নিজেও নিহত হলেন। তাঁর মহিষী কুমুদ্বতী তাঁর অনুগমন করলেন। রঘুবংশম্-এর সপ্তদশ সর্গে তার বর্ণনা করে কবি বলছেন :—

তং স্বসা নাগরাজস্য কুমুদস্য কুমুদ্বতী।
অন্বগাৎ কুমুদানন্দং শশাঙ্কমিব কৌমুদী ॥ ৬ ॥

কুমুদ ফুলেরে আনন্দ দেয় যে শশাঙ্ক নভে,
তার পিছু পিছু জোৎস্নার যথা গতি,
মহাযশস্বী কুশের সহিত করিল গমন তবে
নাগরাজস্বসা মহিষী কুমুদ্বতী।

কুশের পুত্র নৃপতি অতিথি অতুলগুণসম্পন্ন। তাঁর গুণের বর্ণনা আছে রঘুবংশম্-এর সপ্তদশ সর্গে আছে :—

ইন্দোরগতয় পদ্মে সূর্যস্য কুমুদেঽংশবঃ।
গুণাস্তস্য বিপক্ষেঽপি গুণিনো লেভিরেঽন্তরম্ ॥ ৭৫ ॥

চন্দ্রিমা-আলো পশে না কভুও পদ্মের অন্তরে,
সূর্যকিরণ নাহি লভে স্থান কুমুদ ফুলের প্রাণে,
নৃপ অতিথির এমনি আছিল অতুলন গুণরাশি
শত্রুও তাঁর হোতো আকৃষ্ট গুণগরিমার টানে।

রঘুবংশম্-এর একোনবিংশ সর্গে কাম-বিলাসী নৃপতি অগ্নিবর্ণের বিলাস-লীলার ছবি এঁকেছেন কবি কালিদাস :—

যোষিতামুডুপতেরিবার্চিষাং সপর্শনিবৃতিমসাববাপ্নুবন্।
আরুরোহ কুমুদাকরোপমাং রাত্রিজাগরপরোদিবাশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

কুমুদ-ফুল্ল সায়র যেমন চাঁদের পরশ তরে
সারা রাত জাগি ঘুমায় সকাল হলে,



তেমনি নৃপতি অগ্নিবর্ণ কামিনী-পরশ যাচি
সারা রাত জাগি কাটাতেন দিন সুপ্তি-শিয়ানতলে।

প্রিয়ার পরশে দেহে তেমনি আনন্দ-শিহরণ জাগে যেমন শিহরণ জাগে কুমুদের দেহে চাঁদের আলোর ছোঁয়ায়। বিক্রমোর্বশীয়ম্-এর তৃতীয় অঙ্কে এই মনোহারিণী বর্ণনা আছে :—

অন্যৎ কথমিব পুলকৈঃ কলিতং মম গাত্রকং করস্পর্শাৎ।
নোচ্ছ্বসিতি তপনকিরণৈশ্চন্দ্রস্যেবাংশুভিঃ কুমুদম্ ॥ ১২০ ॥

পরশমাত্র যবে শিহরিয়া ওঠে দেহ অনুখন,
বুঝিতে কি কভু বাধে গো তখন প্রিয়া সে ছুঁয়েছে মোরে,
চাঁদের আলোতে কুমুদের দেহে জাগে ঘন শিহরণ,
কুমুদের হিয়া কভু কি কাঁপয়ে রবির কিরণ ভোরে!

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে আমরা কুমুদের দেখা পাই। তৃতীয় অঙ্কে রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে সম্বোধন করে বলছেন :—

তপতি তনুগাত্রি মদনস্ত্বামনিশং মাং পুনর্দহত্যেব।
গ্লপয়তি যথা শশাঙ্কং ন তথাপি কুমুদ্বতীং দিবসঃ ॥ ৪৫ ॥

অয়ি কৃশাঙ্গি! মদন তোমারে দহিছে এ কথা মানি,
মোরে অনঙ্গ অঙ্গার করি পুড়াইছে নিশি দিন,
যত ক্লেশ দেয় দিন চন্দ্রেরে সূর্যের কর হানি,
কুমুদ কভুও এতো ব্যথা নাহি পায় যবে আসে দিন।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর চতুর্থ অঙ্কে কণ্বের একজন শিষ্য বলছেন :—

অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতী মে দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয়শোভা
ইষ্টপ্রবাসজনিতান্যবলাজনস্য দুঃখানি নূনমতিমাত্রসুদুঃসহানি ॥ ৩০ ॥

চাঁদ ডুবে গেলে কুমুদ ফুলের শোভা
ম্লান হয়ে শেষে বিরাজে স্মৃতির মাঝে,
প্রবাসে যাহার প্রিয়তম গেছে সেই নারী বিরহিনী
তার বুকে দুখ অসহ ব্যথায় বাজে।

শকুন্তলাকে নিয়ে কণ্বের দুটি শিষ্য ও বৃদ্ধা গৌতমী দুষ্মন্তের রাজসভায় গেছেন। শকুন্তলাকে তিনি বিবাহ করেছেন এ কথা স্মরণ করতে পারছেন না দুষ্মন্ত দুর্বাসার অভিশাপে। তপস্বীরা বার বার চেষ্টা করে বিফল হয়েছেন। পঞ্চম অঙ্কে দুষ্মন্ত বলছেন তপস্বীকে :—

কুমুদান্যেব শশাঙ্কঃ সবিতা বোধয়তি পঙ্কজান্যেব।
বশিনাং হি পরপরিগ্রহসংশ্লেষপরাঙ্মুখীবৃত্তিঃ ॥ ১০০ ॥

কেবল কুমুদে বিকশিয়া তোলে চন্দ্র,
রবি করে শুধু কমলেরে বিকশিত,
জিতেন্দ্রিয় পুরুষ চিত্তে কাম নাহি পায় রন্ধ্র
নহে পরনারী-পরশনে কলুষিত।

ঋতুসংহারম্-এর শরৎ-বর্ণনায় কুমুদ ছবার দেখা দিয়েছে :—

কাশৈর্মহী শিশিরদীধিতিনা রজন্যো হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি।
সপ্তচ্ছদৈঃ কুসুমভারনতৈর্বনান্তাঃ শুক্লীকৃতান্যুপবনানি চ মালতীভিঃ ॥ ২ ॥

কুমুদে শুভ্র সরোবর আজি মরালে শুভ্র নদীজল

চন্দ্রকিরণে শুক্লা যামিনী, নবকাশফুলে ধরণী,
ছাতিম পুষ্পে শুভ্র বনানী, মালতী কুসুমে বনতল,
শরতে আজিকে সেজেছে সবাই মোহন শুভ্রবরণী।

কহ্লারপদ্মকুমুদানি মুহুর্বিধুন্বংস্তৎসঙ্গমাদধিক শীতলতামুপেতঃ।
উৎকণ্ঠয়ত্যতিতরাং পবনঃ প্রভাতে পত্রান্তলগ্নতুহিনাম্বুবিধূয়মানঃ ॥ ১৫ ॥

সরোবরনীরে পদ্মকুমুদকহ্লারে কাঁপাইয়া, তাদের পরশি সুশীতল সমীরণ,
অতি সযতনে পত্রলগ্ন শিশির বহিয়া আনি, করিছে ব্যাকুল আজ সবাকার মন।

স্ফুটকুমুদচিতানাং রাজহংসাশ্রিতানাং মরকতমণিভাসা বারিণা ভূষিতানাম্।
শ্রিয়মতিশয়রূপাং ব্যোম তোয়াশয়ানাং বহতি বিগতমেঘং চন্দ্রতারকাবকীর্ণম্ ॥ ২১ ॥

মরকতমণি সম নির্মল স্বচ্ছ সায়রজলে কলহংস ও কুমুদ নয়নলোভা,
মেঘ-বিমুক্ত নীল অম্বর শশিতারকায় ভরা অনুরাগ ভরে ধরিছে সায়র-শোভা।

শরদি কুমুদসঙ্গাদ্বায়বো বান্তি শীতা বিগতজলদবৃন্দা দিগ্বিভাগা মনোজ্ঞাঃ
বিগতকলুষমম্ভঃ শ্যানপঙ্কা ধরিত্রী বিমলকিরণচন্দ্রং ব্যোম তারাবিচিত্রম্ ॥ ২২ ॥

শীতল সমীর কুমুদসঙ্গলাভে, মেঘহীন নভ, চারিদিক মনোহর,
নির্মল নীল শরতের ধারা কর্দমহারা ধরা চন্দ্রকিরণে তারকাশোভায় সুশোভিত অম্বর।

দিবসকরময়ূখৈর্বোধ্যমান প্রভাতে বর-যুবতি-মুখাভং পঙ্কজং জৃম্ভতেঽদ্য।
কুমুদপি গতেঽস্তং লীয়তে চন্দ্রবিম্বে হসিতমিব বধূনাং প্রোষিতেষু প্রিয়েষু ॥ ২৩ ॥

প্রভাতসূর্যকিরণস্ফুট সুন্দর শতদল সুন্দরী-নারী-আননের শোভা ধরে,
বিরহবিধুরা রমণীর হাসি সম কুমুদের শোভা চন্দ্র অস্ত গেলে ক্ষীণ হয়ে মরে।

বিকচকমলবক্ত্রা ফুল্লনীলোৎপলাক্ষী বিকসিতনবকাশশ্বেতবাসো বসনা।
কুমুদরুচিরকান্তিঃ কামিনীবোন্মদেয়ং প্রতিদিশতু শরদ্বশ্চেতসঃ প্রীতিমগ্র্যাম্ ॥ ২৬ ॥

নবীন কাশের শ্বেত অংশুকে সোহাগে দেহটি ফিরে,
উৎপল-আঁখি বিকচ-পদ্ম-আননা,
মদ-উন্মনা রমণীর প্রায় প্রীতিতে ভরুক চিত্ত,
শারদলক্ষ্মী শুভ্র কুমুদ বরণা।

তিরিশ — শ্যামালতা

শ্যামালতার কথা কালিদাসের রচনায় ছড়ানো থাকলেও শ্যামালতার ফুলের কথা ঋতুসংহারম্-এর তৃতীয় সর্গে শরৎ বর্ণনায় বারেকের তরে পাই :—

শ্যামালতা কুসুমভারনতপ্রবালাঃ স্ত্রীণাং হরন্তি ধৃতভূষণবাহুকান্তিম্।
দন্তাবভাসবিশদস্মিতচন্দ্রকান্তিং কঙ্কেলিপুষ্পরুচিরা নবমালতী চ ॥ ১৮ ॥

নব কিশলয় কুসুমের ভারে নুয়ে-পড়া শ্যামলতা
তার কাছে হারে রমণীবাহুর আভরণ-পরা শোভা,
অশোক কুসুম নব বিকশিত ফুল্ল মালতী ফুল
হরিতেছে আজ নারীর হাসির কান্তি চিত্তলোভা।

একত্রিশ — সপ্তচ্ছদ ফুল

সাতটি পাতা একটি বৃন্তে বলে এই গাছটির নাম হয়েছে সপ্তচ্ছদ কিম্বা সপ্তপর্ণ। এ আমাদের চির-পরিচিত ছাতিম গাছ। শরতে ছাতিম ফুল ফোটে, শুভ্র তার বরণ, গন্ধটি তীব্র। ঋতু-সংহারম্-এর তৃতীয় সর্গে শরৎ-বর্ণনায় ছাতিম ফুলের দেখা পাই :—



কাশৈর্মহী শিশিরদীধিতিনা রজন্যো হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি।
সপ্তচ্ছদৈঃ কুসুমভারনতৈর্বনান্তাঃ শুক্লীকৃতান্যুপবনানি চ মালতীভিঃ ॥ ২ ॥

কুমুদে শুভ্র সরোবর আজি মরালে শুভ্র নদীজল,
চন্দ্রকিরণে শুক্লা যামিনী নবকাশ ফুলে ধরণী,
ছাতিম পুষ্পে শুভ্র বনানী মালতী কুসুমে বনতল,
শরতে আজিকে সেজেছে সবাই মোহন শুভ্রবরণী।

বত্রিশ — বেতস মঞ্জরী

ভেবে পাই না কি করে বেতস তরুর মঞ্জরী মহাকবির মন পেলো! বেতের ব্যবহার রাজসভায় নিশ্চয়ই ছিলো, কিন্তু বেতস মঞ্জরীর ব্যবহার তো রাজ-অন্তঃপুরে ছিলো বলে জানি নে। বিক্রমোর্বশীয়ম্-এর চতুর্থ অঙ্কে উর্বশী-বিরহকাতর রাজা বনে-উপবনে প্রিয়ার সন্ধান করে ফিরছেন। বর্ষায় প্রকৃতি নানা ফুলের সম্ভারে সেজেছে। তাই দেখে রাজা বলছেন—যৎ প্রাকৃষেণ্যৈরেব চিহ্নৈঃ সম্প্রতি মহারাজোপচারঃ ক্রিয়তে ॥ ২৯ ॥ —বর্ষাকালের নানা বস্তু আমার রাজোচিত সাজসরঞ্জাম, উপকরণ রচনা করেছে। যেমন :—

বিদ্যুল্লেখা-কনকরুচিরশ্রীর্বিতানং মমাভ্রো
ব্যাধূয়ন্তে নিচুলতরুভির্মঞ্জরীচামরাণি।
ঘর্মচ্ছেদাৎ পটুতরগিরো বন্দিনো নীলকণ্ঠা,
ধারাসারোপনয়নপরা নৈগমাশ্চাম্বুবাহাঃ ॥ ৩০ ॥

তড়িৎ-কনকসূতায় গ্রথিত মেঘের চন্দ্রাতপ,
রচিছে চামর নিচুল তরুর মঞ্জরী অনুপম,
গ্রীষ্মের শেষে ময়ূরময়ূরী করে বন্দনাবর,
মেঘদল আনে ধারা সম্ভার নিপুণ বণিক সম।

তেত্রিশ — অতিমুক্তলতা

এই লতাটির তারিফ করেছেন কবি, তবে খুব বেশী নয়। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর তৃতীয় অঙ্কে প্রিয়ম্বদা শকুন্তলাকে বলছেন :—সখি! দিষ্ট্যা অনুরূপঃ তে অভিনিবেশঃ। সাগরং বর্জয়িত্বা কুত্র বা মহানদী অবতরতি। কঃ ইদানীং সহকারম্ অন্তরেণ অতিমুক্তলতাং পল্লবিতাং সহতে ॥ ২৪ ॥

"সখি, তোমার অনুরাগ তোমার যোগ্য হয়েছে। সাগর ছেড়ে মহানদী আর কোথায় গিয়ে নামে? সহকার তরু ছাড়া পল্লবিতা অতিমুক্তলতার ভার কে সইতে পারে?"

বিক্রমোর্বশীয়ম্-এর দ্বিতীয় অঙ্কে উপবনে বেড়াতে বেড়াতে বিদূষক রাজাকে বলছেন :—এষ কৃষ্ণমণিশিলাপট্টসনাথঃ অতিমুক্তলতামণ্ডপো ভ্রমরসঙ্ঘবিঘট্টিতৈঃ কুসুমৈঃ কৃতোপচার ইবাত্র ভবতো বর্ত্ততে। তদনুগৃহ্যতামেষঃ ॥ ৫০ ॥

এই অতিমুক্তলতামণ্ডপে একটি কালো শিলা পাতা। ভ্রমরের তাড়নায় লতা থেকে ফুল ঝরে পড়ে যেন অভ্যর্থনা করছে। এর অভ্যর্থনা দয়া করে গ্রহণ করো।

চৌত্রিশ — মাধবী

মাধবী বিতানের কথা কালিদাসের রচনায় বহু জায়গায় আছে। মাধবী ফুলের কথা এই একটি জায়গাতেই পাচ্ছি। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর ষষ্ঠ অঙ্কে বিদূষক রাজাকে বলছেন :—এষঃ মণিশিলাপট্টকসনাথঃ মাধবীমণ্ডপঃ উপহার রমণীয়তয়া নিঃসংশয়ং স্বাগতেন ইব নৌ প্রতীচ্ছতি। তৎ প্রবিশ্য নিষীদতু ভবান ॥ ৪৫ ॥

এই মাধবীমণ্ডপে মণিময় শিলার আসন বিছানো। মনে হচ্ছে মাধবীলতা আমাদের ফুল-উপহার দিয়ে স্বাগত করছে। কুঞ্জে প্রবেশ করে উপবেশন করো।

পঁয়ত্রিশ — শিরীষ

গ্রীষ্মের ফুল শিরীষ। রৌদ্র-দগ্ধ ধরণীর ব্যথার রক্তিম রূপ নিয়ে সে আসে আমাদের কাছে। পর্যাপ্ত না হলেও কিছু সমাদর সে পেয়েছে কালিদাসের কাছে। কুমারসম্ভবম্‌-এর প্রথম সর্গে পার্বতীর বাহুদুটির অনুপম সৌন্দর্য বর্ণনা করে কবি বলছেন :—

শিরীষপুষ্পাধিকসৌকুমার্যৌ বাহূ তদীয়াবিতি মে বিতর্কঃ।
পরাজিতেনাপি কৃতৌ হরস্য যৌ কণ্ঠপাশৌ মকরধ্বজেন ॥ ৪১ ॥

যত সুকুমার শিরীষ কুসুম তার চেয়ে সুকুমার
গৌরীর বাহুদুটি ছিলো সুন্দর অতি,
বাহুদুটি দিয়ে তাই রচেছিল শিবের কণ্ঠপাশ
শিবের সমীপে যবে পরাভব মেনেছিল রতিপতি।

কুমারসম্ভবম্‌-এর পঞ্চম সর্গে পার্বতী-জননী পার্বতীকে তপস্যা করতে বারণ করে বলছেন :— মনীষিতাঃ সন্তি গৃহেষু দেবতাস্তপঃ ক চ তাবকং বপুঃ।

পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ ॥ ৪ ॥

মোদের ভবনে বিরাজেন সদা বাঞ্ছিত দেবগণ,
কেন তপস্যা? শোভা পায় কি তা তব দেহে সুকুমার?
কোমল শিরীষ কুসুম সে সহে অলিপদপরশন,
তাই বলে কি গো সহিতে সে পারে বিহগের পদভার!

মেঘদূতম্‌-এর উত্তর মেঘ খণ্ডে অলকার সুন্দরীদের বর্ণনায় আছে :—

হস্তে লীলা কমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধম্‌
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননেশ্রীঃ।
চূড়াপাশে নব কুরবকং চারুকর্ণে শিরীষম্‌
সীমন্তে চ তদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্‌ ॥ ২ ॥

বধূদের হাতে লীলার কমল, কুন্দ কুসুম অলকে,
পাণ্ডু আননে আনিয়াছে শ্রী লোধ্র-রসের ঝলকে।
বেণীতে তাদের নব কুরবক কর্ণে শিরীষ অতুল,
সীঁথিতে তাদের বর্ষার দূতী নব কদম্ব দোদুল।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌-এর প্রথম অঙ্কে নটী গাইছেন :—

ঈষদীষচ্চুম্বিতানিঃ ভ্রমরৈঃ সুকুমারকেশরশিখানি।
অবতংসয়ন্তি দয়মানাঃ প্রমদাঃ শিরীষ কুসুমানি ॥ ৯ ॥

শিরীষ ফুলের কোমল কেশরগুলি
অতি ধীরে ধীরে করে অলি চুম্বন,
অতি সযতনে বিলাসিনীদল শিরীষ কুসুম তুলি
রচে তাহা দিয়া কর্ণের আভরণ।

সেই প্রথম অঙ্কেই শকুন্তলার পরিশ্রান্ত অবস্থা দেখে দুষ্মন্ত প্রিয়ম্বদাকে বলছেন :— স্রস্তাংসাবতিমাত্রলোহিততলৌ বাহূ ঘটোৎক্ষেপনাদ্‌ অদ্যাপি স্তনবেপথুং জনয়তি শ্বাসঃ প্রমাণাধিকঃ।



স্রস্তং কর্ণশিরীষরোধি বদনেঃঘর্ম্মাম্ভসাং জালকং বন্ধে স্রংসিনি চৈকহস্তযমিতা পর্য্যাকুলা মূর্ধজাঃ ॥ ১২০ ॥

ঘট তুলে তুলে বাহুদুটি পরিশ্রান্ত, করতল দুটি রাঙা ঘটঘর্ষণে,
ঘন নিঃশ্বাসে কাঁপে স্তনদুটি কানের শিরীষ-আভরণ রাজে কপোলে ঘর্মসিক্ত,
আনন সিক্ত ঘর্মধারায়, কবরী বাঁধন খুলে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে,
একটি হাতেতে ধরে আছে বালা কেশরাশি এলায়িত।

রঘুবংশম্‌-এর ষোড়শ সর্গে শিরীষ ফুলের উপর মনোহর দুটি শ্লোক আছে। প্রথমটি :—

স্বেদানুবিদ্ধার্দ্রনখক্ষতাঙ্কে ভূয়িষ্ঠসন্দষ্টশিখং কপোলে।
চ্যুতং ন কর্ণাদপি কামিনীনাং শিরীষ পুষ্পং সহসা পপাত ॥ ৪৮ ॥

কামিনীগণের কর্ণ হইতে শিরীষের আভরণ
স্খলিত হলেও খসিয়া কুসুম পড়িলনা ভূমিতলে,
কপোল তাদের ঘর্মসিক্ত নখ-ক্ষত-লাঞ্ছিত,
কপোলের ক্ষতে শিরীষের শিখা রয়ে গেলো কত ছলে!

দ্বিতীয়টি :—

অমী শিরীষপ্রসবাবতংসাঃ প্রভ্রংশিনো বারিবিহারিণীনাম্‌।
পরিপ্লবাঃ স্রোতসি নিম্নগায়াঃ শৈবাল লোলাংশ্ছলয়ন্তি মীনান ॥ ৬১ ॥

জলবিহারিণী সুন্দরীদের কানের শিরীষ ফুল
হের ভাসিতেছে নদীর স্রোতেতে, কি শোভা চমৎকার,
ঢেউ-চঞ্চল শিরীষ কুসুমে শৈবাল ভ্রম করি
শৈবাল-প্রিয় মাছগুলি পড়ে ছলনায় বার বার।

ছত্রিশ — পাটল

পাটল নামটি মন্দ নয় কিন্তু আমাদের প্রাকৃত ভাষার পারুল নামটি আরো শ্রুতি মধুর। নিদাঘের ফুল পাটল। ফুলগুলির নিজস্ব গৌরব কিম্বা মাধুর্য যেন কিছুই ছিলো না মহাকবির কাছে, কিম্বা থাকলেও খুবই কম ছিলো। বিলাসিনীদের আভরণ আর কামীজনের চিত্ত-বিনোদন এই দুই কাজের বরাত নিয়েই যেন তারা বনে উপবনে ফুটে উঠেছিলো! ব্যবহারে লাগে বলেই কি ফুলের আদর? ফুল কি তার বিনা প্রয়োজনের সৌন্দর্যে আমাদের ভালোবাসা দাবী করতে পারে না? পাটল ফুলের কথা কালিদাসের রচনায় খুবই কম। অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্‌-এর প্রথম অঙ্কে সূত্রধার বলছেন :—

সুভগসলিলাবগাহাঃ পাটলসংসর্গসুরভিবনবাতাঃ।
প্রচ্ছায়সুলভনিদ্রা দিবসাঃ পরিণাম রমণীয়াঃ ॥ ৮ ॥

সুখকর এবে সলিলে গাহন পাটল ফুলের গন্ধ-মাখানো বায়ু,
তরুতলে ঘুম আসে সহজেই, মধু হয় দিন যতো শেষ হয় আয়ু।

রঘুবংশম্‌-এর ষোড়শ সর্গে দেখি ইক্ষুরসের পুরনো মদিরার সঙ্গে আমগাছের কিশলয় আর নবপ্রস্ফুট পাটল ফুল বিলাসীদের চিত্তবিনোদনে লেগে গেছে :—

মনোজ্ঞগন্ধং সহকারভঙ্গং পুরাণশীধুং নবপাটলং চ।
সংবধ্নতা কামিজনেষু দোষাঃ সর্ব্বে নিদাঘাবধিনা প্রমৃষ্টাঃ ॥ ৫২ ॥

আম্রের নবপল্লব আর নূতন পাটল ফুল,
তারি সাথে হয় ইক্ষুরসের পুরাণ আসব ঢালা,

অতি সুবাসিত এই তিন দিয়ে মুগ্ধ নিদাঘ কাল
নিদাঘ-তাপিত কামিজনদের ঘুচালো সকল জ্বালা।

রঘুবংশম্-এর একোনবিংশ সর্গে নৃপতি অগ্নিবর্ণের বিলাস-লীলার এই বর্ণনা আছে :—

যৎ স লগ্নসহকারমাসবং রক্তপাটলসমাগমং পপৌ।
তেন তস্য মধুনির্গমাৎ কৃশশ্চিত্তযোনিরভবৎ পুনর্নব ॥ ৪৬ ॥

রক্ত-পাটল-ফুল-রঞ্জিত নবকিশলয়-মেশানো
মনোহর সুরা করিতেন পান নৃপতি অগ্নিবর্ণ,
মধু মাস গেলে মনের আগুন হয়ে যেতো যবে নেবানো,
সুরাপান করি সেই আগুনেরে করিতেন নব বর্ণ।

ঋতুসংহারম্-এর প্রথম সর্গের শেষ শ্লোকটিতে নিদাঘের যা যা সুখ-দায়ক তার মধ্যে পাটল স্থান পেয়েছে। ব্যবহারে যা না লাগে তার প্রতি যেন মহাকবির নজর নেই। এমন ব্যবহারিক-বস্তুতান্ত্রিকতা এ যুগেও দুর্লভ!

কমলবনচিতাম্বুঃ পাটলামোদরম্যঃ সুখসলিলনিষেকঃ সেব্যচন্দ্রাংশুহারঃ।
ব্রজতু তব নিদাঘঃ কামিনীভিঃ সমেতো নিশি সুললিতগীতে হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে সুখেন ॥ ২৮ ॥

ভালো লাগে হিম-সলিলে সিনান, মধুর জোছনা যে কালে,
ফোটে শতদল, পাটল ফুলের গন্ধ লুটায় কাননে,
জোৎস্নাপ্লাবিতা নিদাঘ-যামিনী সুললিত গীতগানে
নারীদের সাথে মহা-আনন্দে কাটুক কুসুমশয়নে।

সাঁইত্রিশ — নবমল্লিকা

মধুমাসের ফুল নবমল্লিকা। এর আর একটি মিষ্টি নাম আছে— সপ্তলা। রঘুবংশম্-এর নবম সর্গে নবমল্লিকার সৌন্দর্যের এই সুন্দর বর্ণনা আছে :—

অমদয়ন্ মধুগন্ধসনাথয়া কিসলয়াধরসঙ্গতয়া মনঃ।
কুসুমসম্ভৃতয়া নবমল্লিকা স্মিতরুচা তরু চারু বিলাসিনী ॥ ৪২ ॥

চারুবিলাসিনী নবমল্লিকা গন্ধবাসিত নব-কিশলয়-অধরে
বিকচ ফুলের শুভ্র হাস্য দিয়া আশ্রয়-তরু-চিত্ত সহজে হরে।

রঘুবংশম্-এর ষোড়শ সর্গে এই মধুর শ্লোকটি দিয়ে নবমল্লিকার বর্ণনা করেছেন কবি :—

বনেষু সায়ন্তনমল্লিকানাং বিজৃম্ভণোদ্গন্ধিষু কুট্মলেষু।
প্রত্যেকনিক্ষিপ্তপদঃ সশব্দং সংখ্যামিবৈষাং ভ্রমরশ্চকার ॥ ৪৭ ॥

ফুটিয়া উঠিল বনেতে সান্ধ্যমল্লিকামঞ্জরী,
চারিদিক তারা ভরিয়া তুলিল অনুপম সৌরভে,
যাওয়া-আসা করে কোরকে কোরকে মুগ্ধ ভ্রমর-ভ্রমরী,
মনে হয় তারা কুঁড়ি গুণে গুণে ফেরে গুঞ্জন রবে।

এই ষোড়শ সর্গেই আর একটি শ্লোকে নবমল্লিকার দেখা পাই :—

স্নানার্দ্রমুক্তেষ্বনুধূপবাসং বিন্যস্তসায়ন্তনমল্লিকেষু।
কামো বসন্তাত্যয়মন্দবীর্য্যঃ কেশেষু লোভে বলমঙ্গনানাম্ ॥ ৫০ ॥

মধুমাস গেলে দুর্বল ম্লান হইল মদন তবে
এবে নিদাঘ-তাপিত সিনান-সিক্ত এলায়িত-কুন্তল
কেশেতে সাঁঝের নবমল্লিকা পরে রমণীরা যবে



ধূপ-সুবাসিত কেশ-শোভা হেরি মদন লভিল বল।

ঋতুসংহারম্-এর ষষ্ঠ সর্গে বর্ণনায় এই শ্লোকটি আছে :—

কর্ণেষু যোগ্যং নবকর্ণিকারং চলেষু নীলেষ্বলকেষ্বশোকম্।
পুষ্পঞ্চ ফুল্লং নবমল্লিকায়াঃ প্রয়াতি কান্তিং প্রমদাজনস্য ॥ ৫ ॥

নারীর কর্ণভূষণযোগ্য কুসুম কর্ণিকার ঘনকালো কেশ ভূষণ অশোক ফুল,
নবমল্লিকা তরুটি ভরিয়া ফোটে যে মোহন ফুল, রূপে ভরে তারা নারীর দেহের কূল।

আটত্রিশ — নবমালিকা

জানি না নবমালিকা নবমল্লিকার নাম কি না। মনে হয় তা নয়। প্রাকৃতে এই লতিকার নাম নোমালি। নবমালিকা নামে যে একটি লতা ছিলো তার প্রমাণ পাই অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এর চতুর্থ অঙ্কে। প্রাকৃতে নয়, সংস্কৃত ভাষায় মহাকবি বলাচ্ছেন কাশ্যপের মুখ দিয়ে :—সংকল্পিতং প্রথমমেব ময়া তবার্থে ভর্ত্তারমাত্মসদৃশংসুকৃতৈর্গতা ত্বম্। চূতেন সংশ্রিতবতী নবমালিকেয়ম্ অস্যামহং ত্বয়ি চ সম্প্রতি বীত-চিন্তঃ ॥ ৯৭ ॥

তোমার জন্যে আমি প্রথম থেকেই যেরকম ভেবেছিলুম, নিজের সুকৃতির জোরে তুমি সেইরূপ পতিলাভ করেছো। এই নবমালিকা লতা সহকার তরুকে আশ্রয় করেছে। এই লতা এবং তুমি তোমাদের দুজনের সম্বন্ধেই নিশ্চিন্ত হলাম।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে নবমালিকা লতাটি নবমল্লিকা থেকে আলাদা। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এর প্রথম অঙ্কে তিনবার নবমালিকার উল্লেখ পাই। অনসূয়া বল্‌ছেন শকুন্তলাকে :—হলা শকুন্তলে! ত্বত্তঃ অপি তাতকাশ্যপস্য ইমে আশ্রমবৃক্ষকাঃ প্রিয়তরা ইতি তর্কয়ামি, যেন নবমালিকাকুসুমপেলবা অপি ত্বম এতেষাম্ আলবালপূরণে নিযুক্তা ॥ ৪৬ ॥

সখি, মনে হয় তুমি যতো প্রিয় তাত কাশ্যপের তার চেয়ে প্রিয় এই আশ্রম-তরুগুলি। তা না হলে নবমালিকার মতো কোমল তোমাকে গাছে জল দেওয়ার কাজে লাগাতেন না তিনি।

প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে বল্‌ছেন :—হলা শকুন্তলে! ইয়ং স্বয়ংবর বধূঃ সহকারস্য ত্বয়া কৃতনামধেয়া বনজ্যোৎস্না ইতি নবমালিকা। এণাং বিস্মৃতা অসি ॥ ৫৪ ॥

সখি, এই নবমালিকার নাম দিয়েছিলে তুমি বনজ্যোৎস্না। দেখ, সে কেমন স্বয়ংবরা হয়ে সহকার তরুকে আশ্রয় করেছে। তাকে কি তুমি ভুলে গেছো?

আকুলতার সঙ্গে শকুন্তলা বল্‌ছেন সখিদের :—অম্মো! সলিলসেকসংভ্রমোদ্গত নবমালিকামুজিঝত্বো বদনং মে মধুকরোঽভিবর্ত্ততে ॥ ৬৪ ॥

দেখ, নবমালিকায় জল ঢালায় একটি ভ্রমর তার থেকে উড়ে আমার মুখের দিকে অসাছে।

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এর পঞ্চম অঙ্ক। দুষ্মন্তের রাজসভায় শকুন্তলা এসেছেন। দুষ্মন্ত তাঁকে চিন্‌তেই পারলেন না। তখন শকুন্তলা নানা ঘটনার উল্লেখ করে তপোবনে তাঁদের মিলনের দিনগুলি দুষ্মন্তকে মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন। বল্‌ছেন :—ননু একস্মিন্ দিবসে নলিনীপত্রভাজনগতম্ তব হস্তে সন্নিহিতম্ আসীৎ ॥ ৭৮ ॥

মনে আছে একদিন নবমালিকামণ্ডপে পদ্মপাতায় তৈরী পাত্রে জল নিয়ে তুমি তুলে ধরেছিলে সেই পাত্র?

উনচল্লিশ — অর্জুনমঞ্জরী

নিদাঘেতে ফোটে অর্জুনমঞ্জরী। রঘুবংশম্-এর ষোড়শ সর্গে নিদাঘকালে প্রস্ফুটিত অর্জুনমঞ্জরীর মনোহর ছবি এঁকেছেন কালিদাস :—

আপিঞ্জরা বদ্ধরজকণত্বাৎ মঞ্জর্য্যুদারা শুশুভেঽর্জুনস্য

দগ্ধাপি দেহং গিরিশেন রোষাৎ খণ্ডীকৃতা জ্যেব মনোভবস্য ॥ ৫১ ॥

অর্জুনফুল মঞ্জরীগুলি চূর্ণ পরাগ মেখে
পিঞ্জর রঙে করিল ধারণ অপরূপশ্রী মরি,
ধূর্জটি-রোষে ভস্ম মদন, চূর্ণ ধনুর্গুণ,
মনে হোলো রাজে সে ধনুকগুণ কুসুমের রূপ ধরি।

চল্লিশ — চূতমঞ্জরী

বসন্তের চূতমঞ্জরী কালিদাসের রচনায় বার বার দেখা দিয়েছে। ফলের আশাতেই কি ফলের তারিফ করেছিলেন কবি? কে জানে!

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এর পঞ্চম অঙ্কে অন্তরীক্ষে গীত এই গানটির উল্লেখ আছে :—

অভিনবমধুলোলুপ ত্বং
তথা পরিচুম্ব্য চূত-মঞ্জরীম্।
কমলবসতিমাত্রনির্বৃতঃ
মধুকর! বিস্মৃতঃ অসি এণাং কথম? ॥ ৩ ॥

অভিনবমধুলোভে হে ভ্রমর পরম সোহাগভরে
করেছিলে কতো চুম্বন তুমি আম্রমুকুলদলে,
এবে মধুপানে তৃপ্ত হইয়া ভুলিলে কেমন করে
সেদিনের সেই প্রেমলীলা তব, তার স্মৃতি-পরিমলে!

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এর ষষ্ঠ অঙ্কে প্রথমা উদ্যানপালিকা বলছে :—আতাম্র হরিত পাণ্ডুর বসন্তমাসস্য জীবনসর্ব্বস্য! দৃষ্টঃ অসি চূতকোরক! ঋতুমঙ্গল! ত্বং প্রসাদয়ামি ॥২ ॥ —বসন্তের জীবনসর্বস্ব, হে বসন্ত ঋতুর মঙ্গলস্বরূপ ঈষৎতাম্রহরিতপাণ্ডুবর্ণ আম্রমুকুল, তুমি প্রসন্ন হও। প্রথমা বলছে :—মধুকরিকে! চূতকলিকাং দৃষ্টা উন্মত্তা পরভৃতিকা ভবতি ॥ ৪ ॥ —মধুকরিকা, আমের মুকুল দেখে কোকিল পাগল হয়ে যায়।

দ্বিতীয়া বলছে :—সখি! অবলম্বস্ব মাং যাবৎ অগ্রপাদস্থিতা ভূত্বা চূতকলিকাং গৃহীত্বা কামদেবার্চ্চনং করোমি ॥ ৭ ॥ —সখি, ধর আমাকে, আমি পায়ের ডগায় ভর করে আমের মুকুল তুলে কন্দর্পদেবের অর্চনা করি। প্রথমা বললো :—যদি তোর পুণ্যফলের অর্ধেকও আমাতে বর্তায় তো আমি রাজী। দ্বিতীয়া :—অয়ে অপ্রতিবুদ্ধঃ অপি চূতপ্রসবঃ অত্র বন্ধনভঙ্গসুরভিঃ ভবতি ॥ ৯ ॥ আমের মুকুল এখনো ভালো করে ফোটেনি তবুও বোঁটা ভাঙায় কি সুন্দর গন্ধ বের হচ্ছে।

ত্বমসি ময়া চূতাঙ্কুর! দত্ত কামস্য গৃহীতধনুষঃ।
পথিকজনযুবতিলক্ষ্যঃ পঞ্চাভ্যাধিকঃ শরঃ ভবঃ ॥ ১০ ॥

তোমারে সঁপিনু হে চূতমুকুল পুষ্পধন্বা-কাছে,
পাঁচটি বানের সেরা হও তুমি, হে বনের বিস্ময়,
বসন্তকালে যে পথিকদল সুদূর প্রবাসে আছে,
যেন বিরহিনী পথিক-বধূরা তোমার লক্ষ্য হয়।

রাজার আদেশে বসন্ত-উৎসব বন্ধ। দুটি সখি প্রমোদকাননে বেড়াতে এসে আমের মুকুল তুলে ছড়াচ্ছে। এমন সময়ে কঞ্চুকীর প্রবেশ। সে মেয়েদুটিকে ধমক দিয়ে বল্লে—জানো না বসন্তোৎসব বন্ধ রাজার আদেশে! দেখছো না :—

চূতানাং চিরনির্গতাপি কলিকা বধ্নাতি ন স্বং রজঃ।



সন্নদ্ধং যদাপি স্থিতং কুরবকং তৎ কোরকাবস্থয়া
কণ্ঠেষু স্খলিতং গতেঽপি শিশিরে পুংস্কোকিলানাং রুতং
শঙ্কে সংহরতি স্মরোঽপি চকিতস্তূণার্দ্ধকৃষ্টং শরম্ ॥ ১৩ ॥

আম্রমুকুল কবে দেখা গেছে নাহি পরাগের লেশ,
প্রস্ফুট-প্রায় কুরবকগুলি কুঁড়ি হয়ে থেকে গেলো,
কোকিল-কণ্ঠে সুর বেধে গেলো, যদিও শীতের শেষ,
মদনের তূণে আধো-বার-করা সায়কটি ফিরে এলো।

বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্-এর দ্বিতীয় অঙ্কে এই শ্লোকটি আছে :—

ইদমসুলভবস্তু প্রার্থনাদুর্নিবারং প্রথমমপি মে পঞ্চবাণঃ ক্ষিণোতি।
কিমুত মলয়বাতোন্মূলিতাপাণ্ডুপত্রৈরুপবনসহকারৈর্দর্শিতেষ্বঙ্কুরেষু ॥ ৪৫ ॥

দুর্লভ জনে পাবার তরেতে পাগল পরাণ মম,
পঞ্চ শরেতে খুঁড়িছে হৃদয় নিঠুর পঞ্চশর,
দখিন পবনে চূতমঞ্জরী হয়েছে সঞ্চালিত
ঝরে ঝরাপাতা তাহে ফের যেন জ্বলে ওঠে অন্তর।

মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এর তৃতীয় অঙ্কে মধুঋতুর বর্ণনা করে কবি বলছেন :—

উন্মত্তানাং শ্রবণসুভগৈ-কূজিতৈ-কোকিলানাং
সানুক্রোশং মনসিজরুজঃ সহ্যতাং পৃচ্ছতেব।
অঙ্গে চূতপ্রসবসুরভির্দক্ষিণো মারুতো মে
সান্দ্রস্পর্শঃ করতল ইব ব্যাপৃতো মাধবেন ॥ ২৭ ॥

মত্ত কোকিল কূজনে শুধায় বসন্ত ঋতু মোরে,
যে বেদনা দেছে মদন সে ব্যথা হয়েছে কি সহনীয়?
আম্রমুকুলসৌরভভরা দক্ষিণ সমীরণ
মদনের সুখ কর পরশন সম লাগে রমণীয়।

তৃতীয় অঙ্কে দেখি নিপুণিকা ইরাবতীকে বলছেন :—আলোকয়তু ভট্টিনী! চূতাঙ্কুরং বিচিন্বত্যোঃ আবয়োঃ পিপীলিকাভিঃ দষ্টম ॥ ৭৮ ॥ —দেখ ভট্টিনী, আম্রমুকুল চয়ন করতে এসে আমরা যেন পিঁপড়ের কামড় খাচ্ছি।

সেই তৃতীয় অঙ্কেই আছে :—মুগ্ধে! ভ্রমসংবাধঃ অন্তরীত বসন্তাবতারসর্ব্বস্বং কিং ন নবচূতপ্রসবঃ অবতংসনীয়? ॥ ১১০ ॥ —মুগ্ধে, কেউ কি ভ্রমরের ভয়ে বসন্তের সর্বস্ব ধন যে নবপ্রস্ফুট আম্রমঞ্জরী সেই মঞ্জরীর কর্ণভূষণ পরতে বিরত থাকে?

মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এর চতুর্থ অঙ্কে রাজা বলছেন :—

মধুরস্বরা পরভৃতা ভ্রমরী চ বিবুদ্ধ চূতসঙ্গিন্যৌ।
কোটরমকালবৃষ্ট্যা প্রবলপুরোবাতয়া গমতে ॥ ২১ ॥

মধুরকণ্ঠী কোকিলা ও অলি আম্রমুকুল সাথে
পরমানন্দে প্রেমের লীলায় ছিল দোঁহে নিমগন,
কোথা হতে এসে অকালবৃষ্টি প্রতিকূল বায়ুযোগে
দিল পাঠাইয়া বৃক্ষকোটরে, ভাগ্যের নিপীড়ন।

রঘুবংশম্-এর একোনবিংশ সর্গে বসন্তের এই মোহিনী বর্ণনা রয়েছে :—

দক্ষিণেন পবনেন সম্ভৃতং প্রেক্ষ্য চূত-কুসুমং সপল্লবম্।

অন্বৈষুরবধূত বিগ্রহাস্তং দূরুৎসহবিয়োগমঙ্গলাঃ ॥ ৪৩ ॥

দখিন বাতাস রোমাঞ্চ আনে আম্রমুকুলদলে,
নবকিশলয় মাঝে বিকশিত হেরি চূতমঞ্জরী.
উন্মনা হয়ে বিরহিনী সবে অভিমান ভুলে গিয়ে
অসহ বিরহে তাহার শরণ নিতো প্রেমরসে ভরি।

দেবরাজ ইন্দ্র মদনকে স্মরণ করলেন শিবের তপোভঙ্গের জন্যে। স্মরণমাত্র সখা বসন্তকে নিয়ে মদন এসে হাজির। কুমারসম্ভবম্-এর দ্বিতীয় সর্গে পড়ি :—

অথ স ললিতযোষিদ্ভ্রূলতাচারুশৃঙ্গং রতিবলয়পদাঙ্কে চাপমাসন্য কণ্ঠে।
সহচরমধুহস্তন্যস্ত চূতাঙ্কুরাস্ত্রঃ শতমুখমুপতস্থে প্রাঞ্জলিঃ পুষ্পধন্বা ॥ ৬৪ ॥

রতির বলয়-চিহ্নিত গলে শোভিতেছে ফুলধনু,
রমণীর বাঁকাভ্রূলতার সম ধনুখানি মনোহর.
আম্রমুকুল-সায়ক হস্তে সখা বসন্ত সাথে
ইন্দ্রের কাছে দাঁড়াল মদন জোড় করি দুই কর।

কুমারসম্ভবম্-এর তৃতীয় সর্গে আমের মুকুলের কষায় রসে কোকিলের স্বর আরো মিষ্টি হবার কথা রয়েছে :—

চূতাঙ্কুরস্বাদকষায়কণ্ঠঃ পুংস্কোকিলো যন্মধুরং চুকূজ।
মনস্বিনীমানবিঘাতদক্ষং তদেব জাতং বচনং স্মরস্য ॥ ৩২ ॥

আম্রমুকুল কষায় রসেতে সিক্ত কণ্ঠ-স্বর
করিছে কোকিল মহা-আনন্দে মধুর কূজন-গান,
অতনুর বাণী সম কুহুডাক প্রবেশিল অন্তরে
ঘুচে গেলো অভিমানিনী নারীর বুক-ভরা অভিমান।

কুমারসম্ভবম্-এর চতুর্থ অঙ্কে চূত-মঞ্জরীর উপর দুটি মনোহর শ্লোক আছে। শ্লোকটি :—

হরিতারুণচারুবন্ধনঃ কলপুংস্কোকিলশব্দসূচিতঃ।
বদসম্প্রতি কস্য বাণতাং নবচূতোপ্রসব গমিষ্যতি ॥ ১৪ ॥

হরিত-অরুণ বৃন্তে উঠিবে আম্র-মুকুল ভরি,
জানাবে কোকিল ফুটেছে মুকুল মধুর কূজন করে.
তোমার বিহনে হে কুসুমধনু সেই চূতমঞ্জরী
কার ধনুকের সায়ক হইবে বলে দাও তুমি মোরে।

দ্বিতীয় শ্লোকটি :—

পরলোকবিধৌ চ মাধব! স্মরমুদ্দিশ্য বিলোলপল্লবাঃ।
নিপেঃ সহকারমঞ্জরীঃ প্রিয়-চূতপ্রসবো হি তে সখা ॥ ৩৮ ॥

হে মাধব যবে আমারে স্মরিয়া করিবে স্বস্তয়ন,
কিশলয়-মেশা আম্র-মুকুল দিও তুমি মোরে স্মরি,
সখা, জানো তুমি তোমার বন্ধু মদন সে অভাজন
কতো ভালোবাসে নবপ্রস্ফুট আম্রের মঞ্জরী।

ঋতুসংহারম্-এর ষষ্ঠ সর্গে বসন্ত ঋতুর বর্ণনায় আম্র-মঞ্জরী পাঁচ বার মহাকবির মন ভুলিয়েছে। বসন্ত বর্ণনার প্রথম শ্লোকেই আমের মুকুল দেখা দিয়েছে :—



প্রফুল্ল চূতাঙ্কুরতীক্ষ্ণসায়কো দ্বিরেফমালাবিলসদ্ধনুর্গুণঃ।
মনাংসি বেদ্ধুং সুরতপ্রসঙ্গিনাং বসন্তযোধঃ সমুপাগতঃ প্রিয়ে ॥ ১ ॥

অয়ি প্রিয়ে হের আম্রমুকুলসায়ক শোভিছে করে,
ধনুকের গুণ রচেছে ভ্রমরদলে,
সুরতবিলাসী কামিদের মন করিবারে বিদীরণ,
বসন্ত-বীর আসিয়াছে ধরাতলে।

পুংস্কোকিলশ্চূতরসাসবেন মত্তঃ প্রিয়াং চুম্বতি রাগহৃষ্টঃ।
কূজদ্দ্বিরেফোঽপ্যয়মম্বুজস্থঃ প্রিয়ং প্রিয়ায়াঃ প্রকরোতি চাটু ॥ ১৪ ॥

আম্রমুকুলমধুমাতোয়ালা কোকিলেরা বনতলে
কোকিল প্রিয়ারে চুম্বিছে অনুরাগে,
শতদলবুকে করিছে ভ্রমর গুঞ্জন মনোরম
তুষিতে প্রিয়ারে মৃদুগুঞ্জনরাগে।

তাম্রপ্রবালস্তবকাবনম্রাশ্চূতদ্রুমাঃ পুষ্পিতচারুশাখাঃ।
কুর্ব্বন্তি কামং পবনাবধূতাঃ পর্য্যুৎসুকং মানসমঙ্গনানাম্ ॥ ১৫ ॥

রক্তবরণ নবপল্লবে আনত আম্রতরু
শাখাগুলি তার ফুলে ফুলে গেছে ভরে,
উতল পবনে কম্পিত হয়ে আজিকে রসাল তরু
আকুল করিয়া রমণীর মন হরে।

মত্তদ্বিরেফপরিচুম্বিতচারুপুষ্পা মন্দানিলাকুলিত নম্রমৃদুপ্রবালাঃ।
কুর্ব্বন্তি কামিমনসাং সহসোৎসুকত্বং চূতাভিরামকলিকাঃ সমবেক্ষ্যমাণাঃ ॥ ১৭ ॥

মত্ত ভ্রমর চুমিছে সোহাগে চূততরুমঞ্জরী
কাঁপিছে পবনে সহকার পাতাগুলি,
এ ছবি হেরিয়া কামে উন্মন নবযুবকের দল,
পরাণ তাদের উঠিয়াছে বিয়াকুলি।

আম্রমঞ্জুলমঞ্জরীবরশরং সৎ কিংশুকং যদ্ধনুর্জ্যা
যস্যালিকুলং কলঙ্করহিতশ্ছত্রং সিতাংশুঃ সিতম্।
মত্তেভো মলয়ানিলঃ পরভৃতা যদ্বন্দিনো লোকজিৎ
সোঽয়ং বো বিতরী তরীতু বিতনুর্ভদ্রং বসন্তান্বিতঃ ॥ ২৮ ॥

মঞ্জুল চূত মঞ্জরী দল রচেছে ধনুর শর,
কিংশুক ফুল রচেছে যাহার ধনু,
ধনুকের গুণ রচেছে যাহার অলিকুল মনোহর,
জোছনা রচেছে শ্বেতছত্রের তনু।
মলয় পবন সেবিছে যাহারে মত্ত বারণ সম,
কোকিল যাহার গাহে বন্দনা গান,
সাথে লয়ে সখা বসন্তে আজি অনঙ্গ নিরুপম
সবে মঙ্গল করুক নিত্য দান।

( ক্রমশঃ )

# এক ছিল কন্যা

## স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন খেয়ে উঠে ঘাটের একটু দূরে বেত বনের কাছে চলে যায় তরঙ্গিনী।

মৃগনয়নী একটু এগোয়। দিদি গেল কোথায়? বমি করছে দিদি। মনে বিদ্যুতের মত একটা চিন্তা ওকে কাঁপিয়ে তোলে।

তরঙ্গিনী আসছে।

—দিদি?

মুখটা ধুয়ে তরঙ্গিনী তাকায়। কি সুন্দর তাকায়।

—বমি করলি কেন দিদি?

তরঙ্গিনী হঠাৎ যেন চমকে ওঠে। উত্তর দিতে পারে না।

—কি হোল তোর?—মৃগনয়নীর স্বর এত গম্ভীর যে তরঙ্গিনী রীতিমত ভয় পেয়ে যায়। তক্ষুণী উত্তর দিতে পারে না।

তরঙ্গিনী সর্বাংগে চোখ বুলিয়ে মৃগনয়নীর ভ্রূদুটো কুঁচকে যায়। কিছু বলে না।

তরঙ্গিনী বলে—আমার শরীরটা কি রকম করছে ভাই। চললুম। বলেই হন্‌হন্ করে চলে যায় তরঙ্গিনী। মৃগনয়নী তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। চোখে পড়ে একটা শালুক ফুলের কুঁড়ি পানার ওপর ভাসছে। একটা মাছরাঙার পায়ের নখের ঝাপটায় টুকরাটুকরা হয়ে গেল ফুলটা। আশ্চর্য! সংসার ভরা শুধু বিস্ময়। যা তারা চায় না, তাই-ই হয়। নানা চিন্তায় ভরা মনের বোঝা নিয়েই দিনের পর দিন কাটে।

হঠাৎ এক ঝলক বাতাস বয়ে গেল সেদিন সন্ধ্যায়। একটু একটু গরম পড়েছে। বাতাসটা যেন পালক বুলিয়ে গেল স্নায়ুর ওপর। মধুমাখা পালক। মনটা উধাও। এক ঝলকানীতে স্থির হয়ে গেছে মন। কি যেন চাই। কি যেন না পেলে সব শূন্য। মন উধাও হোল তার সন্ধানে। পলাশের শাখায় হলুদ-সবুজ পাতা দেখা গেল। গাছটা যেন ভরে উঠল রূপে। কে'পে কে'পে উঠল নোতুন রসসঞ্চারে। কাকে যেন চাই। এক আভরণ, এত আভরণের কোন মূল্যই যেন থাকবে না, কি একটা না হলে। পূর্ণ হয়ে উঠতে পারছে না। নিস্তব্ধ দুপুরে আমবাগানের ডালে ডালে কি যে ডাকে ওরা। কি আনন্দের আক্ষেপ ওদের। শুধু কি কোকিল? কত পাখীর কত কথা। অবিরত ডাকছে। কাকে। কে জানে? মৃগনয়নী থমকে বসে থাকে। কিছুই ভাবে না। অথচ মনের দিকে যখন তাকায়। তখন দেখে ভাবছে। ওর কথাই ভাবছে। আকাশ পাতাল। ছাই ভস্ম ভাবছে। নিজেই লজ্জায় মুখটা নামায় মৃগনয়নী। তরঙ্গিনীর দিকে আর তাকান যায় না। রূপ ফেটে পড়ছে বললে ঠিক যা বোঝায় তাই। ভেতর থেকে এক রূপের জ্যোতি ফুটে বেরোচ্ছে চোখে মুখে। ঘর থেকে প্রায় বেরোয় না। বলে শরীর ভাল নয়। জ্বর জ্বর করে। সর্বশরীর ঢেকে নুয়ে পড়ে বেরোয়। কি অসুখ কে জানে।

বসন্ত এবার রূপসম্ভার উজার করে দিয়েছে যেন। বনে বনে। মনে মনে। বাতাসের ছোঁয়া যে এত মিষ্টি, একটা ফুলের যে এত সৌরভ, মনে যে এত মধু, কে জানত! বসন্ত প্রায় কেটে যায় যায়। মৃগনয়নীর স্নায়ুগুলো সব যেন বিবশ হয়ে এসেছে। ছেলে হাঁটবার চেষ্টা



করে। পড়ে যায় উঠোনে। পড়ুক। উঠতে ইচ্ছে হয় না ওর। ধরতে ইচ্ছে হয় না। এমনি এক বিবশ মুহূর্তে একখানা চিঠি আসে। মৃগনয়নীর চিঠি। বনবিহারীই লিখেছে। চিঠিখানা বেশী বড় নয়।

অনেকদিন চিঠি দিতে পারি নাই। অফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর আর লিখিবার মত শক্তিও থাকে না জানিবা। একটি দুঃসংবাদ দিতেছি। দাদা বৌঠানকে বাসায় আনবার নিমিত্ত দেশে গিয়া আর একটি বিবাহ করিয়া দুই বধূ লইয়া আসিয়াছে। সন্তানের আশায় বিবাহ করিয়াছে বলিয়া রটাইয়াছে। নোতুন বৌঠানকে সহ্য করিতে পারিতেছি না। তোমাকে আনিতে যাইব জানিবা। আলাদা বাসা ভাড়া করিয়া যাইব। খোকা কেমন আছে? তোমার কুশল সংবাদ দিবা। ইতি আঃ বনবিহারী দেব শর্মণঃ।

বার বার পড়তে হয় চিঠিখানি। ভাসুর আবার বিয়ে করছে। কালো বৌ নোতুন বৌ দুজনই এসেছে। কালো বৌয়ের চোখদুটো মনে পড়ে। কানের কাছে কথাকটা বাজে,— তোর ছেলে হলে আমায় দিবি? ছেলেপুলে হয়নি বলে আবার বিয়ে করেছে ভাসুর। কিন্তু এমন বউ থাকতে আবার বিয়ে? মৃগনয়নী কালোবউয়ের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পায় স্পষ্ট। স্পষ্ট দেখতে পায় ওর চোখের ভাষা।—বলেছিলুম তোকে। এই ভয়ই তা' করেছিলুম। এ ভয়টা বরাবরই ছিল না এমন নয়। কথায় বার্তায় প্রকাশও করেছে কালোবউ। কিন্তু বেশী প্রকাশ পেয়েছে তার মা হবার আকাংখা। তাই বলে একেবারে আরেকটা বিয়ে! সতীনের ঘর! সমবেদনায় ভরে ওঠে মৃগনয়নীর বুক। নোতুন জা' খুব ভাল মনে হচ্ছে না। যা লিখেছে তাতে কালো বউয়ের দুর্দশা যে কতখানি পর্যন্ত হতে পারে। ও হয়ত ধারণাই করতে পারছে না। উনি আলাদা বাসা করবেন। তবেই হয়েছে! অন্তরে অসামান্য খুসী জাগলেও কালোবউয়ের প্রতি সমবেদনা সেটাকে পুরো স্বীকার করতে দেয় না। অমন জা'কে ছেড়ে আলাদা হওয়া! কিন্তু উপায়ই বা কি? চিঠিখানা আর একবার দেখে। কই কবে আসবে কিছু লেখেনি ত'? আসব মানে ত' চার বছর পরও হতে পারে। চারদিন পরও হতে পারে। বোধহয় শীঘ্রই আসবে। নইলে লিখে জানাত। নোতুন সংসার করতে তার প্রথম প্রথম কেমন লাগবে কে জানে। আলাদা সংসার। নিজের একার সংসার। ভাবতে যেন কেমন লাগে। একটা পুরো সংসারের সর্বময়ী হয়ে ওঠা। সর্বময়ী। সে যা করবে তাই। অবাধ স্বাধীনতায় বাধা ত' কেউ দেবেই না বরং কখনও কখনও বনবিহারীই হয়ত জিজ্ঞেস করবে—তেল লাগবে কতটা বা এ মাসটা ডাল কিছু কম করেই আনো। সোডা সাবান কিন্তু লাগবেই। ওটা কমে হবে না। নোংরামী মোটে দেখতে পারে না মৃগনয়নী। ঘরদোর নোংরা করাও চলবে না। বিছানা ত' নাই। কিন্তু রাত্তিরে বনবিহারী যদি মদ খেয়ে ফেরে? একা একা যে ভয়ে মরবে মৃগনয়নী! তখন? ছেলেটা কে'দে ওঠে। দুম্ দুম্ করে দু'ঘা বসিয়ে দেয় মৃগনয়নী। এমন কাঁদুনে। জ্বলালে! যেমন বাপ তেমনি ছেলে! বাপ আবার কত জ্বালাবে কে জানে! পুঁটি প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে ঢোকে।

—বুকের ভেতরটা কেমন করছে তাই!— হাঁপাতে থাকে।

—কি হোল পুঁটিদি?

—সর্বনাশ হয়ে গেছে।

—কি সর্বনাশ হোল?

পুঁটি এক গেলাস জল গড়িয়ে খেয়ে নেয়। শুয়ে পড়ে হাঁপাতে থাকে।

বুকে হাত দিয়ে বলে।—হাঁপটা কেন কমছে নারে?

মৃগনয়নী তাড়াতাড়ি কোল থেকে ছেলেকে নামায়।

—হাত পা কেমন অবশ অবশ লাগছে।

পুঁটি কি আবার অজ্ঞান হয়ে পড়বে নাকি?

ভয় পেয়ে যায় মৃগনয়নী। ছেলেটা কেঁপে ওঠে। কাঁদুক। ও পুঁটির দিকে এগিয়ে আসে।—কি হোল বলত'? পুঁটির বুকের ওঠানামা তখনও কমেনি। বুকে হাত বুলিয়ে দেয়। সাড়ীটা বুক থেকে সরিয়ে দেয়। পুঁটিদির বুকে হাত বোলাতে বোলাতে কষ্ট লাগে ওর। পাঁজরার হাড় হাতে লাগে। কি রোগা আর দুর্বল পুঁটিদি! একটু সুস্থ হয়ে ওঠে পুঁটি।

—কি ব্যাপার বলত? অমন করে ছুটে এলি কেন?

—বলতে আমার মুখে বাধছে ভাই।

—কেন?

—স্বপ্নেও এ কথা ভাবতে পারিনি।

—শুনি কি কথা?

—বলতে পাচ্ছিনা। ভাবতেও পাচ্ছি না। এর চেয়ে সবাই আমরা মরে গেলুম না কেন?

পুঁটিদি আবার হাঁপায় উত্তেজনায়। উত্তেজনা এত প্রবল যে নিজের স্নায়ুকে স্থির করতে চেষ্টা করেও পারছে না। মৃগনয়নীর রাগ হয় পুঁটিদির ওপর। ছেলেটাকে আবার কোলে নেয়। একটু সময় দেয় পুঁটিকে। চুপ করে চোখ বুজে শুয়ে থাকে পুঁটি। খানিক্ষণ। রাগ করে আর কথা বলে না মৃগনয়নী। ছেলেকে দুধ খাওয়ায়। পুঁটি কিছুক্ষণ জিরিয়ে ওঠে। আবার গিয়ে এক গেলাস জল খায়। তারপর আস্তে আস্তে এসে মৃগনয়নীর পাশে বসে। আস্তে আস্তে বলে,—কর্তামা বোধহয় বাঁচবে না এ খবর শুনলে। কি এমন খবর! মুখে কিছু বলে না মৃগনয়নী। রাগে।

—মেজখুড়ীমা ঘরে দোর দিয়েছে। এখনও খোলেনি।

—কে মা?—অবাক হয়ে বলে মৃগনয়নী।

—হ্যাঁরে। তবে আর বলছি কি? এমন সর্বনাশ কি কেউ ভাবতে পেরেছি?

মৃগনয়নী অবাক হয়ে তাকায়।

—খুড়োমশাইবা কেউ জানে না এখনও। জানলে যে কি হবে?

আবার বলে মৃগনয়নী,— কি ব্যাপারটা খুলে বলো না।

—কাউকে বলবি না বল?

—না।

—কাউকে না। গাঁয়ের যেন কাক পক্ষী টের না পায়।

—না, না, না, বলব না। উঃ! এতক্ষণ ধরে কথাটা কি বলতে পারলে না।

—এগিয়ে আয় আরও।

বলে পুঁটি নিজেই এগিয়ে যায় ওর কাছে। কাণের কাছে মুখটা এনে খুব আস্তে কি বলে প্রথমটা মৃগনয়নী বুঝতে পারে না। বলে,— একটু জোরে বল? একটু, জোরে বলে পুঁটি,— দিদির ছেলেপিলে হবে। পাচমাস। বলেই আবার হাঁপাতে থাকে পুঁটি।

—খবদ্দার বলছি কাউকে বলবি না কিন্তু!

মৃগনয়নী কাঠের মত বসে থাকে। তরঙ্গিনী সন্তানসম্ভবা। বিধবা তরঙ্গিনী এক করে বসেছে? এর চেয়ে তরঙ্গিনী মরেছে শুনলেও খুসী মৃগনয়নী। বোধহয় মৃগনয়নীর মা-ও। মরুক। আজই যেন মরুক! বাবার যেন আর একবর শুনতে না হয়! আজ রাত্রে কি তরঙ্গিনী মরতে পারে না ঠাকুর? বাবা শুনলে কি হবে? বার বার বাবার কথাটাই মনে হয় মৃগনয়নীর। কি হবে বাবার ভাবা যায় না। এর পরও কি বাবা আর বাঁচবে?



—বাবা শুনেছেন?

—না। — বলে পুঁটি আবার শুয়ে পড়ে।

—কর্তামা শুনেছেন?

—হ্যাঁ।

—কর্তামা কি বললেন?

—কিছু না। ঠাকুর ঘরে গিয়ে বসে আছেন। আমিও শিবমন্দিরে চললুম ভাই। বাড়ীতে আমার ভয় ভয় করছে।

মৃগনয়নী কথা বলে না। বার বার মনে হয় ওর দিদি এত নীচে নামল? কি করে নামতে পারল? কত মিথ্যে কথা বলেছে তাকে। সত্যকে দেখতে পেয়েছিল মৃগনয়নী। সত্যকে দেখাটা তার সতাই। ভূত দেখা নয়। ভূত বলে উড়িয়ে দিল দিদি। অম্লান মুখে অজস্র মিথ্যা বলে গেল। এক পাপ ঢাকতে হাজার পাপের আশ্রয় নিতে হোল, নিতে হবে। পুঁটি গুটিগুটি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ যেন ভূত দেখে আবার ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে। মৃগনয়নীর গায়ে খুব জোরে ঠেলা মারে।

—কি হোল আবার?

—আসছে।

—কে?

পুঁটি কিছু বলবার আগেই তরঙ্গিনী এসে ঘরে ঢোকে। ওর নিতম্বভার আজ বিষে রসিয়ে আছে বলে মনে হয়। আজত তরঙ্গিনীর রূপের জ্যোতি যেন আগুনের মত জ্বলছে বলে মনে হয়। এ আগুণ সংসারটাকে জ্বালাবে। শুধু জ্বালাবে না, ছাইয়ের শ্মশান তৈরী করবে। তরঙ্গিনী সর্পিনী। তরঙ্গিনী নাগিনী। ওর নিশ্বাসে বিষ। ওর দৃষ্টিতে বিষ। ও ঘৃণ্যা। ও পণ্যা হয়েছে। মৃগনয়নী পাষাণের মত বসে থাকে। পুঁটি শুয়ে পড়ে চোখ বুজে থাকে। তরঙ্গিনীর মুখটি মুহূর্তে ম্লান হয়ে যায়। তবু একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে,—তোর ছেলেকে একটু দে। ঘুম পাড়িয়ে দি। মৃগনয়নী কেঁপে ওঠে। ছেলেকে জোর করে চেপে ধরে পাথরের মত বসে থাকে। তাকায় না ওর দিকে তরঙ্গিনী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এগিয়ে গিয়ে আবার পিছিয়ে আসে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। মাথাটা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। আরও একটু সময়। তারপর যেমন এসেছিল তেমনি ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

## তেরো

মনের অনমনীয় আবেগের সুতীব্র জোয়ারে কঠিন বৈধব্যের বাঁধও ভেঙ্গে যায়। কেন ভাঙ্গে? সংসারে এ বড় বিচিত্র লীলা। সুকঠোর সংযম এক মুহূর্তে আলগা হয়ে যেতে পারে। কত অঘটনই না ঘটতে পারে অতৃপ্ত যৌবনে। মৃগনয়নী কতবার ভেবেছে মানুষের এই বয়েসটা বড় ভয়াবহ, বড় মিষ্টি, ভারী করুণ। অভিনব সমাবেশে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যৌবনের প্রতিটি মুহূর্ত। নিদারুণ ভাবাবেগের চাপ সইতে হয় প্রতি মুহূর্তে। তবু মানুষ জান্তব আবেগের কবলে পড়ে না, তাই সে মানুষ। তীক্ষ্ণতর বুদ্ধি দিয়ে সুতীক্ষ্ণ বিচারের ধারে কুঁচো কুঁচো করে কেটে ফেলে তীব্রতম কামজ রূপচিন্তাকে মানুষই পারে আর কেউ নয়।

মৃগনয়নীর অভিজ্ঞতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এই সত্য যে সত্যের চেয়ে মিথ্যার তীব্রতা বেশী। গতি বেশী, কিন্তু সত্যের গভীরতা থাকলে, তাকে তীব্র গতিতে এলেও তলিয়েই যেতে হয়।

হয়ত তলিয়ে যাবার আগে একটু তোলপাড় হয় মনের সাগরে। সত্যের বোধ যেখানে অগভীর, হালকা, সেখানেই মিথ্যার জয়। দিদিরই বা কি দোষ? এক একবার ভাবে মৃগনয়নী দিদিরই বা কি দোষ! মোহটা মিথ্যে হলেও তীব্র, ও হেরে গেছে সেখানে। ভেবেছিল জিতবে। যৌবনের শেষ রসবিন্দুটুকুও উপভোগ করতে ছাড়বে না। ও ঠকবে না। কিন্তু ঠকতে হোল সকলের অলক্ষ্যে নিজেরই। সবচেয়ে ঠকছে তরঙ্গিনী। সমাজের শাসন না থাকলেও আজীবন এর জের টেনে জেতে হবে। একদিন বুঝতে হবে, হয়ত বহুদিন পরে। যে যৌবনকে সর্বস্ব জেনে ও জীবনের বাজিতে জিততে চেয়েছিল, সেও আজ চলে গেছে। তরঙ্গিনী হেরে যাবে সেদিন, আজ নয়। পিপাসা মেটাতে গিয়ে পিপাসা বেড়ে যাবে। সেদিন আর এক বিন্দু জলও পাওয়া যাবে না।

কথাগুলো এখনই যে মৃগনয়নী পুরোপুরি ভাবতে পারছিল এমন নয়। জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার পরে এ সত্য ওর কাছে উদ্ভাসিত হয়েছিল—পরে—অনেকদিন পরে। আজ মৃগনয়নী যেন কিছুতেই সইতে পারছিল না তরঙ্গিনীকে। আশ্চর্য হোল আরও, যখন দেখল তরঙ্গিনী হাসছে। মা কতবার জেরা করল তরঙ্গিনীকে, — কে এমন সর্বনাশ করলে? তার নাম কি? তরঙ্গিনী জবাব দিলে,— তার নাম তরঙ্গিনী। মা যত রাগল, তরঙ্গিনী তত হাসল। কর্তামাও এলেন।

—হ্যাঁরে, এমন সর্বনাশ কে করলে?

—আমি।

এইটুকু বলেই তরঙ্গিনী আবার হাসল। তরঙ্গিনীর চোখদুটো জ্বলছিল আর হাসছিল। সমস্ত সংসারটাকে উড়িয়ে দিতে চাইছে ও হেসে। সবাইকে। সাহসে আর শক্তিতে অতুলনীয় হয়ে উঠছে তরঙ্গিনী। এতবড় সাহসকে নিন্দা করতেও বাধে, ঘৃণা করতেও বাধে। তবু মৃগনয়নী বহুদিন ভেবে দেখেছিল, এ সাহসটা অনেকটা ডাকাতের সাহসের মত, খুনীর সাহসের মত। এই সাহসের অপূর্ব সাদৃশ্য ছিল কর্তাবাবুর চোখেমুখে। কর্তাবাবু অপরূপ তার তেজে। কিন্তু সে নিষ্ঠুর তেজ রাধারাণীকে অসহায় ভাবে মেরেছিল। তার গ্লানি এত তেজেও কাটল না। কাটাতে পারল না কর্তাবাবু। বললেন কর্তামা, — তোর কি ভয়ও হোল না?,

—না। — স্পষ্ট গলা দিদির।

—এত বড় বংশে একি করলি তুই?

এ কথার উত্তর দিল না তরঙ্গিনী। যেন খুব কঠোর কিছু উত্তর দিতে পারত, এমনিভাবে তাকাল কর্তামার দিকে। আর কেউ কিছু বলল না। তরঙ্গিনীর বাইরে বেরুন বন্ধ হয়ে গেল। দিনরাত ওই ঘরেই থাকতে হোত। যাওয়া ঘরে, নাওয়াও ঘরে। বড় বড় টবে জল দিয়ে হোত স্নানের। সর্বদা পাহারা থাকত এক বুড়ী মালিনী। মনিকা ঝিকে বরখাস্ত করা হোল। রাত্রে হৃদয়দাকে রাখা হোল ওর ঘরের বারান্দায়। পাহারায়। হৃদয়দা একখানা রামদা নিয়ে শুয়ে থাকত বারান্দার ঠিক তরঙ্গিনীর দরজার সামনে।

বসন্তকাল বড় তাড়াতাড়ি কাটে। এই এলো আর এই গেলো। আমের মুকুল ঝরল, কচি কচি আমে ভরে গেল গাছগুলো। বিকেলে পশ্চিম উত্তর কোনটায় কাকের ডিমের মত কালো রঙ জমল। জমাট মেঘ। গাছের পাতাগুলো স্থির হয়ে গেল অসহ্য গুমোট গরমে। খানিক পরেই ঝিরঝিরে বাতাস। তারপর বাতাসের ঝাঁপটা, সঙ্গে সঙ্গে গুড়ো গুড়ো বৃষ্টি। আরও বাতাস। কচি আম ঝরে পড়ল টপ টপ। ডালগুলোর মাতামাতি। দুটো কলাগাছ ভেঙে পড়ল। লাউ গাছটা শেকড় শুদ্ধ উপড়ে গেল। আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে বড় আরাম। সন্ধ্যার পর আবার সব নিথর, নিস্পন্দ। একটুও বাতাস নেই। গুমট গরমে ঘরের



ভেতর ছটফট করতে হয়। ছেলেটা কেঁদে কেঁদে ওঠে। ঘুম নেই। একটুও ঘুম নেই কারো চোখে। যত রাজ্যের ভাবনা এসে জড়ো হয় মাথায়। মা, কর্তামা, খুড়োমা ওরাও জেগে থাকে। খুড়োমশাইকে বলা হয়। রামতরণ তখনও জানেন না। অনেক পরামর্শের পর শোনা যায় তরঙ্গিনীকে কাশী পাঠান হবে। লোকে জানল, তীর্থ করতে যাবে তরঙ্গিনী। মন খারাপ, শরীর খারাপ। ঘর থেকে বেরোয়, কারো সঙ্গে কথা কয় না। তীর্থ করে ঘরে আসুক। ভেতরে ভেতরে সব বন্দোবস্ত হয়। কে সঙ্গে যাবে? সঙ্গে যাবে ষোড়শী মালিনীর মা। বয়েস হয়েছে, এ সব ব্যাপারে পোক্ত। তাকে কিছু টাকা দেয়াও নাকি হয়ে গেছে। আর যাবে নায়েব মশাই নিজে। সব ব্যবস্থা করে আসবার জন্যে বয়স্ক পাকা মানুষের দরকার।

—নায়েব মশাই কি উপকারই যে আমাদের করলেন।— বললে পুঁটি।

—তাই নাকি! — বলে মৃগনয়নী মুচকী হাসল। ও জানে, নায়েব মশাই তার নিজের ছেলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে যাচ্ছে। এ প্রায়শ্চিত্ত তাকেই করতে হচ্ছে। সংসারে বিস্ময়ের আর সীমা নেই! বিচিত্রতার শেষ নেই।

—কবে যাবে?

পুঁটি বললে,— বোধহয় দিন পাঁচেকের ভেতর। ভোর রাতে চলে যাবে। কেউ জানবে না।

—দিদি জানে না?

—না। দিদিকে জানান বারণ।

—ও যদি না যেতে চায়?

—ওর মুখ বেঁধে নিয়ে যাবে, পাল্কীতে ভরে। হাত পাও বাঁধবে।

শিউরে ওঠে মৃগনয়নী।

—এ বাজে কথা পুঁটিদি!

—বারে। খুড়োমশাই বলেছেন। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে সব করবেন।

—বাবা জানে না।

—বোধহয় শুনেছেন। নয়ত যাবার আগে একবার খুড়োমশাই বলবে তাঁকে। কেউ বলতে সাহস করছে না।

—যাবার দিন বলিস কিন্তু, আমি দিদিকে একটু দেখব।

পুঁটি চোখ বড় বড় করে। — ও বাবাঃ! আর কেউ যেতে পাবে না সেখানে।

—আচ্ছা সে আমি দেখবখন।

মৃগনয়নী মনটা ভার হয়ে ওঠে। দিদির জন্যে মনটা হঠাৎ বড় খারাপ লাগে। রাত্রি হয়ে আসে। পুঁটি পুজোর ঘরে চলে গেছে। মৃগনয়নী চুপ করে বসে থাকে অনেকক্ষণ ছেলে কোলে নিয়ে। অনেকক্ষণ। বার বার মনে হয় দিদি চলে যাবে। হয়ত একেবারেই চলে যাবে। আর কি ফিরবে। ফিরতে পারবেও না হয়ত। এ কথা চাপা থাকবে না। কিছুদিনের ভেতর রটে যাবে সর্বত্র। তখন তরঙ্গিনীর পক্ষে এখানে ফেরা আর চলবে না। ফিরলে কেই বা গ্রহণ করছে! হয়ত কালই ভোরে চলে যেতে পারে। আর দেখা হবে না। গত তিনমাস একটা কথাও বলেনি মৃগনয়নী। তরঙ্গিনীর দিকে তাকায়ওনি। দু একবার মুখোমুখি হয়েছে। তরঙ্গিনী কাছে এসে কি একটা বলতে চায়। মৃগনয়নী মুখটা ঘুরিয়ে চলে যায় তক্ষুণী। বেশ ঝেঝে তরঙ্গিনীর মুখটা ম্লান হয়ে ওঠে। উঠুক। হন্ হন্ করে চলে যায় মৃগনয়নী।

# রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস

রথীন্দ্রনাথ রায়

বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে অভিনবত্বের সঞ্চার করেন, প্রায় অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী মোটামুটি সেই ধারাই কথা-সাহিত্যের গতি নির্দেশ করেছিল। এই পর্বের উপন্যাসের মধ্যে প্রধানত দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায় — ইতিহাস-মিশ্র রোমান্স-নির্ভর আখ্যায়িকা ও সমাজ-সমস্যা-মূলক উপন্যাস। বঙ্কিম-পর্বের বাংলা কথাসাহিত্যের দুটি ধারাই রমেশচন্দ্রের উপন্যাসকে পরিপুষ্ট করেছিল। ইংরাজী সাহিত্যে কৃতবিদ্য রমেশচন্দ্র ইংরেজীতেই সাহিত্যচর্চা সুরু করেন, কিন্তু তাঁকে মাতৃভাষায় সাহিত্যসেবায় অনুপ্রাণিত করেন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। এই অবিস্মরণীয় ঘটনার প্রায় তেইশ বছর পরে রমেশচন্দ্র নিজেই বঙ্কিমচন্দ্রের সেই উৎসাহ-বাণীর কথা স্মরণ করেছেন :

These words created a deep impression in me, and two years after this conversation, my first Bengali Work, 'Banga Bijeta', was out in 1874.

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণার কথাই এখানে বলা হয়েছে, কিন্তু কার্যতঃ শুধু প্রেরণা নয় বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রভাবও তাঁর রচনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অবশ্য ইতিহাসের ওপর বাল্যকাল থেকেই তাঁর একটি গভীর আকর্ষণ ছিল। স্কট ছিলেন তাঁর প্রিয়তম লেখক। স্কটের উপন্যাসের মধ্যযুগীয় পটভূমিকা, বর্ণ-বিচিত্র ঐতিহাসিক রোমান্স ও বীরযুগের রোমাঞ্চকর জীবনচর্যার ছবি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাস রমেশচন্দ্রের ইতিহাস-রস-রসিকতাকে পরিতৃপ্ত ক'রেছিল। তিনি নিজেই বলেছেন :

I do not know if Sir Walter Scott gave me a taste for history, or if my taste for history made me an admirer of Scott; but no subject, not even poetry, had such a hold upon me as history.

রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার আদর্শ স্কট। তবে এ কথাও যথার্থ যে, যে সময় তিনি তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন, তখন বাংলাসাহিত্যে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস প্রকাশিত হয় — 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী'। স্কটের উপন্যাস ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের সচেতন সংস্কার যে রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল, তার প্রমাণ তাঁর প্রথম উপন্যাসেই লক্ষণীয়। 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার দশ বছরের মধ্যে অনেকেই বঙ্কিম-প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন।

তথাপি রমেশচন্দ্রের পথ স্বতন্ত্র। সেকালের অধিকাংশ ইতিহাসমিশ্র কাহিনী রচয়িতাদের মত রমেশচন্দ্র ইতিহাসের মধ্যে সুলভ রোমান্স-রসের অনুসন্ধান করেন নি। রোমান্স পিপাসা তাঁরাও ছিল, কিন্তু তাকেই তিনি চূড়ান্ত ক'রে তোলেন নি। দূর অতীতের কুহেলি-মণ্ডিত রোমান্সের দিগন্ত থেকেই তাঁর যাত্রা সুরু, কিন্তু তার বহুস্তর পরিণতি অকুণ্ঠ দেশপ্রেমিকতায়, দেশের লুপ্ত-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টায় — এখানে তিনি যথার্থই চারণ-কবির ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। রমেশচন্দ্র চারখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন— 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪), 'মাধবী কঙ্কণ' (১৮৭৭), 'জীবন-প্রভাত' (১৮৭৮) ও 'জীবন-সন্ধ্যা' (১৮৭৯)। উপন্যাসগুলির কালানুক্রমিক গতির দিকে লক্ষ্য করলেও দেখা যাবে যে ঐতিহাসিক রোমান্সকে কাটিয়ে



ক্রমাগত ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার দিকেই ঔপন্যাসিকের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই চারখানি উপন্যাস একত্রিত ক'রে 'শতবর্ষ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৭৯)। 'শতবর্ষ' নামকরণ থেকে মনে হয় একশো বছরের ভারত-ইতিহাস নিয়ে ক্রনিক্‌ল বা ঐতিহাসিক কাহিনীবৃত্ত রচনাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।। অবশ্য অতি ক্ষীণ সূত্রাকারে কাহিনীগুলির মধ্যে সংযোগ থাকলেও, স্বতন্ত্র উপন্যাস হিসেবেই এদের আসল মূল্য। 'বঙ্গ বিজেতা'র ঘটনাকাল ১৫৮০-৮২, টোডরমলের তৃতীয়বার বাংলায় আগমনের পটভূমিকায় উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। ঘটনাকালের দিক থেকে 'জীবন-সন্ধ্যা' 'বঙ্গ বিজেতার'ও পূর্ববর্তী — এখানকার কাহিনী সুরু হ'য়েছে ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দের আহেরিয়া উৎসব থেকে। ঘটনাকালের দিক থেকে 'মাধবী-কঙ্কণ'-এর স্থান তৃতীয়। তখন শাজাহানের রাজত্বকাল, সুজা বাংলাদেশের সুবাদার। রাজসিংহাসনের জন্য ভ্রাতৃবিরোধ ও ঔরঙ্গজেবের সিংহাসন প্রাপ্তিতে কাহিনীর উপসংহার। উপন্যাসটির ঘটনা-পরিধি প্রায় চার পাঁচ বছর (১৬৫৩-১৬৫৭)। শতবর্ষের শেষাংশ 'জীবন-প্রভাত'-এর কথাবস্তু। ১৬৬৩ থেকে কাহিনীর আরম্ভ — ঔরঙ্গজেব ও শিবাজীর কাহিনীই 'জীবন-প্রভাত'-এর মূল আখ্যায়িকা। হল্‌দিঘাটের যুদ্ধের (১৫৭৬) প্রাক্‌-লগ্ন থেকে রায়গড়ে শিবাজীর অভিষেক (১৬৭৪) কাল পর্যন্ত শতবর্ষের কাহিনী-চক্র! কিন্তু চারখানি উপন্যাস একত্রিত ক'রে 'শতবর্ষ' নাম দেওয়ার খুব বেশী যুক্তি আছে ব'লে মনে হয় না। এর কারণ, শতবর্ষের গ্রন্থন-বিন্যাসের শিথিলতা, দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতিগত দিক থেকে উপন্যাস চারখানির মধ্যে পার্থক্য প্রচুর।

'বঙ্গ-বিজেতা' রমেশচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। আখ্যায়িকা-অংশের কেন্দ্র তিনটি মুঙ্গের, ইচ্ছাপুর ও চতুর্বেণ্টিত দুর্গ। মুঙ্গেরের কাহিনীর মধ্যেই অনেকটা ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাস অংশের নায়ক রাজা টোডরমল্ল। কিন্তু এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চরিত্রটিকে নিতান্তই নিষ্প্রভ মনে হয়। তাঁর গুণাবলী ও ব্যক্তি-চরিত্রের বর্ণনা লেখকের মুখ থেকেই যতটুকু শোনা যায়, তার বেশী প্রত্যাশা করাও ঠিক নয়। কারণ চরিত্রটির অন্তর্জীবন ব'লে কোন বস্তুই নেই। ঔপন্যাসিক যে কথা বিস্তৃতভাবে বলার চেষ্টা করেছেন, টোডরমল্লের চারিত্রিক বাঞ্ছনা থেকে তা উদ্ভূত হয় নি। কাহিনীর প্রথমেই লেখক তাঁর আখ্যায়িকা-সম্পর্কে একটি আভাস দিয়েছেন : "কি প্রকারে এই নিঃশঙ্ক বীরপুরুষ তৃতীয়বার বঙ্গদেশ জয় করিয়া বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ শাসন করেন, তাহা এই আখ্যায়িকায় বিবৃত হইবে।" কিন্তু কেন্দ্রীয় চরিত্রের অস্পষ্টতার জন্য লেখকের এই উদ্দেশ্যটি সফল হয়ে উঠতে পারে নি—তা ছাড়া চরিত্রটিকে যুগ-জীবনের প্রতিটি স্পন্দনের সঙ্গে অনিবার্যভাবে সংযুক্ত করা হয় নি।

ইচ্ছাপুর ও চতুর্বেণ্টিত দুর্গের কাহিনীকে প্রধানত কাল্পনিক কাহিনী বলা যায়। তবে এই কাহিনী দুটি নিতান্ত শূন্যগর্ভ ও নিরালম্ব রোমান্স মাত্র নয়। এই সময় প্রায় সাড়ে তিন বছর তিনি রাজকার্য উপলক্ষে নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করেন। (১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩ — ৩০শে অগাস্ট, ১৮৭৬)

স্থানীয় জনশ্রুতি ও লৌকিক কাহিনীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে। চতুর্বেণ্টিত দুর্গের আধুনিক নাম চৌবেড়ে — ইতিহাস ও জনশ্রুতি-মিশ্রিত নানাকাহিনী সেখানে প্রচলিত আছে। আসল কথা 'বঙ্গ বিজেতা' উপন্যাসের উপাদান অংশ তিনটি — ইতিহাস, লৌকিক কাহিনী ও কল্পনা। রমেশচন্দ্র ইতিহাসের কোলাহল-মুখর রাজপথ ও এর জনবিরল গলিপথ সম্ভবত দু ধারার মধ্যে একটি সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য তিনি আলোকরঞ্জিত রাজপথেরই যাত্রী, কিন্তু আশে-পাশের অনভিজাত গলিপথও তাঁর কাছে এক বিস্মৃত দিনের ছায়া-দীর্ঘ কম্পমান যবনিকা ব'লে মনে হ'য়েছে! রমেশচন্দ্র কৌতূহলী হ'য়ে সেই যবনিকা-প্রান্ত উত্তোলন

করেছেন মাত্র, কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করেন নি। সে দায়িত্ব পরবর্তীকালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছেন।

টোডরমল্লকে বাদ দিলেও অন্যান্য চরিত্রও তেমন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে পারে নি। দেশ-কালের অতিরিক্ত কতকগুলি প্রাণহীন পুতুল হ'য়ে উঠেছে মাত্র। এমন কি কাহিনীর অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র ইচ্ছাপুর জমীদারপুত্র ইন্দ্রনাথ, সর্বত্র উপস্থিত আছেন বটে, কিন্তু কোথায়ও তাঁর ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে নি। শকুনি 'ভিলেন' চরিত্র, কিন্তু সেখানেও জীবনবোধ- বিবর্জিত একটি টাইপ চরিত্র ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। সে মানুষের পাশববৃত্তির হাতিয়ার মাত্র — যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, তাকে রক্ত-মাংসের মানুষ বলেই মনে হয় না। মহাশ্বেতা চরিত্রের সহন-শীলতা, আভিজাত্য ও প্রতিহিংসাবৃত্তি খানিকটা মানবীয় মর্যাদা দিয়েছে। 'শকুনি' ও 'মহাশ্বেতা' এই দুটি নামকরণের মধ্যে যথাক্রমে মহাভারত ও কাদম্বরীর প্রভাব আছে — সম্ভবত এই দুটি চরিত্রের খানিকটা বৈশিষ্ট্যও সঞ্চারিত করার চেষ্টা করা হ'য়েছে। বলাবাহুল্য এই দুটি ক্লাসিক চরিত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা সহজ নয়।

কাহিনীর মধ্যে দুর্বলতম অংশ উপেন্দ্রনাথ ও কমলার আখ্যায়িকাটি। বাস্তব জীবনের সঙ্গে সর্বসম্পর্ক-বর্জিত এই চরিত্র দুটি নিতান্ত অস্বাভাবিকভাবে কাহিনীর বৈচিত্র্যবৃদ্ধি করেছে। বহিরাশ্রয়ী ঘটনার অকারণ চমকসৃষ্টি উপন্যাসটির অন্তর্নিহিত গতিবেগকে পদে পদে খর্ব করেছে। অলৌকিকত্ব, আকস্মিকতা কাহিনীকে সমতলমণ্ডিত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। বিশ্বেশ্বর পাগলিনীর দৈবশক্তি ও তার বাস্তব পরিচয়টির মধ্যে একটি প্রবল বিরোধ আছে। 'বঙ্গ বিজেতা'র ওপরে 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রভাব স্পষ্ট — মহাশ্বেতা যেন বিমলা ও বিমলা যেন আয়েষার প্রতিচ্ছবি হ'য়ে উঠেছে। 'বঙ্গ বিজেতা' অবিমিশ্র রোমান্স, — কিন্তু এই প্রাথমিক প্রচেষ্টার মধ্যেও রমেশচন্দ্র যে ইতিহাস আনুগত্য দেখিয়েছেন তা বঙ্কিমের চেয়ে সত্যনিষ্ঠ ও স্পষ্টতর। কিন্তু বঙ্কিমের কল্পনা-প্রসারতা ও সৃষ্টিনৈপুণ্য তাঁর ছিল না। 'দুর্গেশনন্দিনী'র সঙ্গে 'বঙ্গ-বিজেতা'র তুলনা করলে এ সত্য সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

দ্বিতীয় উপন্যাস 'মাধবী কঙ্কণ'-এ রমেশচন্দ্র প্রাথমিক প্রচেষ্টার জড়তাকে অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন। ইতিহাস-চিন্তণ ও ঔপন্যাসিক ধর্ম—দুটির থেকেই 'মাধবীকঙ্কণ' রমেশচন্দ্রের উন্নত শিল্পশক্তির পরিচয় বহন করে। মূল কাহিনীর দিক থেকে ইতিহাস হয়তো মুখ্য নয়, কিন্তু নায়কের দৈব বিড়ম্বিত জীবনের সঙ্গে ইতিহাসের বিচিত্র বর্ণের সূত্র এক অবিচ্ছেদ্য-বন্ধনে গ্রথিত। নরেন্দ্র-হেমলতা-শ্রীশচন্দ্র — কোনটিই ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। কিন্তু বৃহত্তর ইতিহাসের স্পন্দন তাদের জীবনকেই বৈচিত্র্য-মুখর করে তুলেছে। বাল্য-প্রণয়-বিড়ম্বিত নরেন্দ্রনাথ বাংলাদেশের এক অখ্যাত পল্লীগ্রামকে বৃহত্তর ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। যদিও শ্রীশচন্দ্র ও হেমলতার দাম্পত্য-জীবনের ওপর ভারত ইতিহাসের আবর্ত-সঙ্কুল, অধ্যায়টি তেমন গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, তথাপি এখানকার ইতিহাস-চিত্রের একটি বিশেষ মূল্য আছে।

'বঙ্গ-বিজেতা'-য় ইতিহাসের স্পর্শ আছে, কিন্তু সে ইতিহাস ম্লান প্রাণহীন, কিন্তু 'মাধবীকঙ্কণ' উপন্যাসের ইতিহাস প্রাণ-চঞ্চল ও গতি-মুখর—রমেশচন্দ্র এখানে একটি ঐতিহাসিক আবহ সৃষ্টি করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রখর মধ্যাহ্নে, সম্রাট শাজাহানের রাজত্বের অন্তিমলগ্নে যে ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রামের প্রলয়ঙ্কর শিখা জ্বলে উঠেছিল, তাকেই মধ্যযুগীয় রোমান্সের দূর-বিসর্পী রহস্যের সঙ্গে সমন্বিত করে রমেশচন্দ্র এক অসাধারণ যুগচিত্রকেই উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। পটভূমিকার বিস্তৃতিও বিস্ময়কর। ভাগীরথী তীরবর্তী একটি



নিস্তরঙ্গ পল্লীগ্রাম থেকে লেখকের ইতিহাসদৃষ্টি সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে— বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে বারাণসী, বারাণসী থেকে বিলাস-বিভ্রমময় দিল্লী, এমন কি মোগল রাজান্তঃপুরের ভীষণ-রমণীয় সৌন্দর্যের বিষপুষ্পের সন্ধানও তিনি দিয়েছেন। উজ্জয়িনীর যুদ্ধের পরে ইতিহাস-সৃষ্টি সঞ্চারিত হ'য়েছে নূতন পথে। এবার আর বাদশাহী রোমান্সের মোহ-মদির কাহিনী নয়— এবার শৈলবন্ধুর আরাবল্লীর পাষাণ-শিলায় অঙ্কিত এক বীরত্ব মণ্ডিত দুঃসাহসিক দেশপ্রেমিকতার ইতিহাস। পরবর্তীকালের 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যায়' বীজ উপন্যাসের এই অংশেই লক্ষ্য করা যায়। চিতোর, যোধপুর, উদয়পুর, একলিঙ্গ দেবের মন্দির প্রভৃতি এক সংগ্রামশীল জীবনের গৌরব-দীপ্ত ইতিহাসকেই উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। স্বার্থ-কৌটিল্য, মোগল হারেমের উচ্ছৃঙ্খল বিলাস, ষড়যন্ত্র সঙ্কুল রাজনৈতিক জটিলাবর্ত — যুগ-জীবনের প্রতিটি সত্য যেন রমেশচন্দ্র জাতিস্মরের মত বর্ণনা ক'রেছেন। নরেন্দ্রনাথের রণক্লান্ত অর্থচেতন স্মৃতি-দর্পণে জেগে ওঠা 'বেগম সাহেবার সরাই'-এর রহস্যময় ভীষণ রমণীয় চিত্র ও জেলেখার ব্যর্থ-প্রেমের কয়েকটি আবেগ-নিবিড় মুহূর্ত বর্ণনায় রমেশচন্দ্র উচ্চাঙ্গের কল্পনাশক্তিরও পরিচয় দিয়েছেন। লেখক কোনটিকেই বাস্তবের সূর্যালোকিত জগতে টেনে আনেন নি—তার ফলে একটি করুণ-সুন্দর সূক্ষ্মাসার গীতি-মূর্ছনার সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভবত আর কোন ক্ষেত্রেই রমেশচন্দ্র তাঁর হৃদয়াবেগকে এমনভাবে মুক্তি দেন নি। জেলেখার জ্বালাময় জীবনের মর্মান্তিক পরিসমাপ্তি অদৃশ্যভাবে নরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যতকেই যেন মসী-রঞ্জিত ক'রে তুলেছে। একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদের ওপর আরব্য উপন্যাসের গভীর প্রভাব আছে। ইরাণী রোমান্সের এমন জীবন্ত ও বর্ণাঢ্য চিত্র বাংলাসাহিত্যে দুর্লভ।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু নরেন্দ্র-হেমলতা ও শ্রীশচন্দ্রের কাহিনী। নরেন্দ্র ও শ্রীশ-চন্দ্রের চারিত্রিক বৈপরীত্যকে লেখক কয়েকটি সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যময় মন্তব্যের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। নরেন্দ্রনাথ তার অভিমান-ক্ষুব্ধ, ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা নিয়ে বৃহত্তর জীবন-স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—এও যেন তার চরিত্রেরই স্বরূপ। শ্রীশচন্দ্রের শান্ত, সংযত চরিত্রটি হেমলতার শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রেছে মাত্র, কিন্তু তার হৃদয়ের গোপন-গুহায় কোন সাড়া জাগাতে পারেনি—বিবাহিত জীবনের মধ্যেও একটি ম্লান ও ধূসর ছায়া সঞ্চারিত হ'য়েছে—মিলনের সতৃষ্ণ হৃদয়াবেগ এখানে নেই। অপর পক্ষে, হেমলতাকে ঘিরে নরেন্দ্রনাথের প্রেমের বিচিত্র অভিব্যক্তি—তার উচ্ছ্বসিত অভিমান, অসংবরণীয় হৃদয়াবেগ, প্রীতিসমুজ্জ্বল কল্যাণকামনা, একটি জীবন্ত হৃদয়ের লীলা-চাঞ্চল্য অপূর্ব হয়ে উঠেছে। রমেশচন্দ্রের প্রেম-চিত্রণ সাধারণত বিশেষত্ব-বর্জিত ও বর্ণহীনতা। কিন্তু 'মাধব-কঙ্কণ' উপন্যাসটি তার একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। 'মাধব-কঙ্কণ' উপন্যাস-প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের কথা মনে হয়। বাল্য প্রণয়ের পরিণতি। উভয়ক্ষেত্রেই অভিশপ্ত কিন্তু চরিত্র-চিত্রণে ও অন্তর্জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটনে বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব শিল্প-সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। বাস্তবজীবনের সঙ্গে মানব-নিয়তি ও দুর্বিগাহ্য রহস্যকে একসূত্রে যুক্ত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অশান্ত জীবন-জিজ্ঞাসা, কবিকল্পনার মহিমাদীপ্ত ঐশ্বর্য ও উচ্চতর ট্রাজেডির মহৎ সমন্বিতি রমেশচন্দ্রের পক্ষে অনায়ত্তই ছিল। তবে 'চন্দ্রশেখর' ও 'বিষবৃক্ষের' মত রমেশচন্দ্রও দাম্পত্য-বন্ধনকেই জয়যুক্ত করেছেন।—যে প্রেম বিবাহ-বন্ধনের দ্বারা স্বীকৃত হয়নি, তার বৈচিত্র্য ও হৃদয়াবেগ যতই থাকুক না কেন, বঙ্কিমচন্দ্র বা রমেশচন্দ্র কেউই তাকে চরম ব'লে স্বীকার করেন নি।

'মাধব-কঙ্কণ'-এর পরে উপন্যাস রচনায় রমেশচন্দ্র সম্পূর্ণ নূতন পন্থতি ধরেছেন।

'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'—উপন্যাস দুটিতে রমেশচন্দ্রের প্রবণতা বিশুদ্ধ ইতিহাসের দিকে। পূর্ববর্তী দুটি উপন্যাসে ইতিহাসের স্থান অনেকখানি গৌণ, ইতিহাস বহির্ভূত ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকে ইতিহাসের রঙ্গীন মশালের আলোয় রঞ্জিত করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু 'জীবন-প্রভাত' ও জীবন-সন্ধ্যায় ইতিহাস সর্বগ্রাসী হ'য়ে উঠেছে। শিবাজীর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র জাতির নবীন অভ্যুত্থান, জীবনের বীরত্বমণ্ডিত দুঃসাহসিক মুহূর্ত এত তীব্র ও বেগবহুল যে ব্যক্তি হৃদয়ের স্পন্দনগুলি সেখানে লুপ্ত হয়েছে। 'জীবন-সন্ধ্যা'তেও তাই—রাজপুতজাতির অদম্য দেশপ্রেম, বজ্র-কঠোর সংকল্প, রাজপুত বীরাঙ্গনায় আত্মহুতির জ্বলন্ত ইতিহাস যে ঐতিহ্যমণ্ডিত গৌরব-কাহিনীর সৃষ্টি করেছে, তার আড়ালে তেজসিংহ-পুষ্পকুমারীর প্রেম নিতান্তই নিষ্প্রভ হ'য়েছে। এই দু'খানি উপন্যাসে রমেশচন্দ্র সমগ্রভাবে জাতীয়-জীবনের একটি বীর-যুগেরই Heroic age বর্ণনা করেছেন। এই কারণে চরিত্রগুলির কোন নিজস্ব রূপ নেই—তারা যেন বৃহত্তর ঐতিহাসিক বিক্ষোভের এক একটি তরঙ্গ। তাদের লৌহদৃঢ় চোখ ঝলসে দেয়, কিন্তু তার অন্তরালের রক্তমাংসের রূপটি চোখে পড়ে না। তবু 'জীবন-প্রভাতে'র মধ্যে দু' একটি ক্ষেত্রে চরিত্র-চিত্রণের যে সামান্য চেষ্টা আছে তার মূল্য কমনয়। শিবাজীর চরিত্রটি মোটামুটি নিপুণভাবেই ফুটেছে। রঘুনাথজী হাবিলদার প্রভুভক্তি ও দেশপ্রেমের একটি হাতিয়ার মাত্র।

'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যায় ব্যক্তি-চরিত্র বিকাশের সামান্যতম প্রচেষ্টাও নেই। এখানে রমেশচন্দ্র শুধু দেশ ও কালকেই দেখেছেন যেন একটি জাতীয় জীবনের পতন-অভ্যুদয় বর্ণনাই মুখ্য হ'য়ে উঠেছে। টডের রাজস্থান-কাহিনীকে অনুসরণ ক'রে রমেশচন্দ্র সরল, সত্যনিষ্ঠ ও বাহুল্যবর্জিত আখ্যায়িকায় ভারত-ইতিহাসের এক কীর্তি-মুখর কাহিনীকেই আবৃতি করেছেন। আহেরিয়া উৎসব, রাঠোর-চন্দাবতের বংশগত বিরোধ, সূর্যমহল দুর্গের পুনরুদ্ধার,—সমস্তই একত্রিত হ'য়ে প্রতাপসিংহের দুর্জয় ও সংগ্রামশীল জীবনের গৌরব-দীপ্ত কাহিনীকে বৃহত্তর জাতীয় জীবনের আনন্দ-বেদনার সঙ্গে এক করে তুলেছেন। এখানে প্রতাপসিংহ যেন কোন ব্যক্তি নন, জাতীয়-জীবনের প্রতীক। চারণ-কবির বিস্মৃত ছন্দটিকে যেন লেখক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'জীবন-সন্ধ্যায় ব্যক্তি পরিবার, এমন কি প্রেম-জীবনকেও অতিক্রম ক'রে বড় হ'য়ে উঠেছে জাতীয় জীবনের অভীপ্সা ও মহৎ যুগ-জীবনের প্রসারিত পটভূমি। ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠ আনুগত্যে, রমেশচন্দ্র এই দু'টি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রকেও অতিক্রম করেছেন। সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ এই দু'খানি উপন্যাসকে "খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস" বলেছেন। অবশ্য ইতিহাস অংশ সম্পর্কে রমেশচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা প্রশংসনীয়, কিন্তু উপন্যাস অংশটি তেমনি দুর্বল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাস আলোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "বঙ্কিমবাবু সেই ইতিহাস ও মানব উভয়কেই একত্র করিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।"—রমেশচন্দ্র তার শেষ দু'টি উপন্যাসে ইতিহাস ও মানবকে সমন্বিত করতে পারেননি, এই খানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে বড় প্রভেদ।

রমেশচন্দ্র দু'খানি সামাজিক উপন্যাস লিখেছিলেন—'সংসার' (১৮৮৫) ও 'সমাজ' (১৮৯৪)। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস ও সামাজিক উপন্যাস রচনার মধ্যে বেশ কয়েক বছরের ব্যবধান ছিল। এই কয়েকবছরের মধ্যে রমেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠকীর্তির স্বাক্ষর আছে। 'ঋগ্বেদ-সংহিতা'র বঙ্গানুবাদ (১৮৮৫-৮৫) ও 'হিন্দুশাস্ত্রে'র সংকলন ও অনুবাদ (১৮৯৩-৯৭) সম্ভবত রমেশচন্দ্রের মনোজীবনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস আলোচনার আগে এই তথ্যটির কথাও মনে রাখতে হবে। সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে রমেশচন্দ্র



আমাদের শান্ত নিরুদ্বেগ পল্লীজীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। রমেশচন্দ্রের বিশ্লেষণ খুব গভীর নয়, কিন্তু পল্লীগ্রামের চিত্র ও চরিত্রগুলির মধ্যে মোটামুটি একটি নম্র-সুন্দর মাধুর্য ও স্বাভাবিকত্ব আছে। 'সংসার' উপন্যাসে বিধবা বিবাহ এবং 'সমাজ' উপন্যাসে অসবর্ণ বিবাহের কথা আছে। 'সংসার' উপন্যাস প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে'র কথা মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। 'সংসার' উপন্যাসে 'বিষবৃক্ষে'র প্রসঙ্গ আছে। বিন্দু সুধাকে বিষবৃক্ষের পরিণাম সম্পর্কে বলেছে : "গল্প আর কি। নগেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দের বিবাহ হইল, কিন্তু তাহাতে সুখের হইল না, কুন্দ শেষে বিষ খাইয়া মরিল।" (ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ) সম্ভবত বঙ্কিমের এই ব্যবস্থা রমেশচন্দ্রের মনঃপুত হয় নি — তাই তিনি শরৎ সুধার বিবাহ দিয়ে 'সংসার' উপন্যাস শেষ করেছেন। কিন্তু 'সমাজ' উপন্যাসটির মধ্যে রমেশচন্দ্রের প্রচারধর্মীতা শিল্পদৃষ্টিকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন ক'রেছে। বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গে তালপুকুর ও কলকাতা—পল্লী ও নগর দু'দিকের ছবিই তিনি এঁকেছিলেন, কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ প্রতিপন্ন করার জন্য সনাতনবাটি জমিদার পরিবারের এক রোমাঞ্চকর ইতিহাস যুক্ত করেছেন। সুশীল ও দেবী প্রসাদের অসবর্ণ বিবাহকে সম্ভব করে তোলার জন্য ঘটনাটির মধ্যে অসঙ্গত অতি-নাটকীয় উপাদান সন্নিবেশিত করতে হয়েছে। রামপ্রসাদ সরস্বতীর আবির্ভাব যেমন অস্বাভাবিক, তেমনি অসঙ্গত। আসল কথা অসবর্ণ বিবাহ সম্ভব ক'রে তোলার উৎসাহ-আধিক্য 'সমাজ' উপন্যাসটিকে ব্যর্থ করেছে। সমস্যাটির বাস্তব ও প্রয়োগগত দিকের কথা তাঁর একবারও মনে হয় নি। তথাপি রমেশচন্দ্রের চিন্তায় যে অগ্রগামী যুগের স্বপ্ন নিহিত ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি এক সময় ভগিনী নিবেদিতার কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার মধ্যেই তাঁর মনোজীবনের সুন্দর ছবি ফুটেছে :

Dreams ! Dreams ! some will exclaim. Well, let them be so,—it is better to dream of work and progress than to wake to inaction and stagnation.

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে রমেশচন্দ্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র মনীষী রমেশচন্দ্রের একটি অংশ মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ সাহিত্য-কীর্তির মাঝখানে রমেশচন্দ্রের রস-সাহিত্যের তাৎপর্য পূর্ণ ভূমিকাটি আজ বিস্মৃত প্রায়। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে বঙ্কিমযুগের সাহিত্যিক হ'য়েও ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসাকে তিনি একটি নূতন পথ দিতে চেয়েছিলেন। 'মাধবী-কঙ্কণ'-এর অচিরতার্থ প্রেমের বেদনাও ঊনিশ শতকের কথাসাহিত্যের এক দুর্লভ আবিষ্কার।

# সান্নিধ্য

## চিন্তামণি কর

### বিপ্লবী সেন

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের পরেই বাংলাদেশে যে সব ছেলেমেয়েদের শুরু হয়েছিল বাল্য ও যৌবন, ভারতে স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রচেষ্টা তাঁদের জীবনে জাগিয়েছিল নূতন প্রেরনা ও উদ্দীপনা। এঁদের অনেকে এই আন্দোলনে ঘোরতর সক্রিয় কর্মী হয়ে পেয়েছিলেন কারাবাস অসীম নির্য্যাতন ও চরমদণ্ড। অন্যেরা কার্য্যত এই অভিঘাতে ঝাঁপিয়ে না পড়লেও একেবারে নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে থাকতে পারেনি। আপাত দৃষ্টিতে আজকে হয়ত অনেকের মনে হবে যে ভারতে স্বাধীনতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠায় কংগ্রেস ও গান্ধীজীর অহিংস ও অসহযোগ পন্থাই এর সাফল্যের সম্পূর্ণ দাবী করতে পারে। সন্ত্রাসবাদকে নৈতিক কারণে অন্যায় পথ ভাবলেও এর প্রতিক্রিয়া যে ভারতের ভূতপূর্ব শাসকশক্তির ভিত্তিকে প্রচণ্ড ঘা দিয়ে আলগা করে দিয়েছিল তার প্রমাণ যদি আজ আমাদের সামনে স্পষ্ট না হয়ে থাকে ভবিষ্যতে জাতীয় সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস বড় বড় হরপে লিখে জানাবে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠায় কতখানি দান এই পথবেয়ে এসেছিল। এটাও ঠিক যে ভারতের বাইরে ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণের সুনিয়ন্ত্রিত আন্দোলন তদানিন্তন ব্রিটিশ রাষ্ট্র অধিনায়কদের মনে এদেশের আসন্ন ভবিষ্যত সম্বন্ধে বেশ একটা সুস্পষ্ট ছাপ লাগিয়েছিল। এই দুটি কারণ ব্যতিরেকে ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার দিন পিছিয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভবনা ছিল। সন্ত্রাসবাদ সূত্রপাতের প্রাক্কালে স্বাধীনতাকামী বাঙ্গালি নওজোয়ানদের একটা বিশিষ্ট খসড়া দিকে দিকে দেখা যেত "দাদা" রূপে। এমনি এক দাদার সম্মোহনে কৃষ্ণনগর শহরে স্কুল কলেজে পড়া ছেলেরা ভিড়েছিল তাঁর চারপাশে। ইনি ছিলেন শহিদ্ অনন্তহরি মিত্র।

সাদাসিধে ধরণের এই স্পষ্টভাষী এই দাদাটির সান্নিধ্যে এসেছিলেন সেন। সেন এর পিতা ছিলেন এ্যাসিস্ট্যান্ট্ সার্জন হুগলী থেকে বদলি হয়ে কৃষ্ণনগরে এসেছিলেন। যুগান্তর সমিতির দলভুক্ত অনন্তহরি তখন এই শহরে স্কুল কলেজের ছেলেদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন নৈশবিদ্যালয়, দরিদ্র ভাণ্ডার, সংকার সমিতি, আখড়া, লাইব্রেরী ইত্যাদি। গান্ধীজী যুদ্ধমান সন্ত্রাসবাদী সব সমিতিগুলিকে অনুরোধ করেছিলেন যে, যদি তারা তাদের উগ্রনীতিকে বন্ধ-রেখে অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনকে সাহায্য করে তা হলে একবছরের মধ্যে তিনি স্বরাজ এনে দেবেন। এই সমিতিগুলির প্রতিশ্রুত এক বছরের নিষ্ক্রিয় আবহাওয়ায় অহিংস আন্দোলন পুরো মাত্রায় চালিয়ে গান্ধীজী এক বছরে স্বরাজ আনতে অপরাগ তো হলেন বটেই উল্টে তিনি বছর শেষ হলে বন্দী হয়ে গেলেন কারাবাসে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দেওয়া চুক্তি শেষ হওয়ায় সন্ত্রাসবাদ আবার পুরোদমে চালু হয়ে গেল। স্বামী বিবেকানন্দের নৈতিক আদর্শ সামনে রেখে যে সব ছেলেদের এতদিন অনন্ত হরি নিরীহভাবে সমাজসেবায় নিযুক্ত রেখেছিলেন এই বার তাদের কানে শুনিয়ে দিলেন সংগ্রামের মন্ত্র। তাদের সামনে ধরে তুললেন দেশী-বিদেশী বিখ্যাত বিপ্লবীদের অগ্নিময় জীবনাদর্শ। তারা এইবার পড়তে লাগল। ভারতের ধর্মকাহিনী নয়, শহিদ বিপ্লবীদের জীবনরাচিত। সংগ্রামে দৃঢ়সংকল্প ও নির্ভরশীল কয়েকটি তাঁর অনুচর চাইল তাঁর কাছে অস্ত্রের সন্ধান। তিনি বল্লেন বিনা টাকায় অস্ত্রের সংস্থান কি করে হবে অতএব



টাকার জোগাড় দেখ। তারা বস্ত্র ডাকাতি করে টাকার জোগাড় করবে। কিন্তু অনন্তদার তাতেও আপত্তি। তিনি বল্লেন পরের ধন কেড়ে নেবার আগে নিজের যা আছে তাই দান করার পর তোমরা এই উপায় অবলম্বনের যোগ্য অধিকারী হবে। এমেন অনাথপিণ্ডদ চাচ্ছেন শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য্য করে সেন আরম্ভ করলেন টুইশানি এবং পুরো রোজগারের দশটাকা মাসে মাসে দিতে লাগলেন সমিতিকে। নিজের ঘরে করলেন প্রথম ডাকিতি এবং সংঘে এনে দিলেন বাক্স ভেঙ্গে চুরী করা নিজের মায়ের গলার সোনার হার। এই প্রথম দীক্ষা সম্পূর্ণ হলে তিনি পেলেন একটি রিভলবার। তারপর চল্‌ল নদীর ওপারে গোপনে লক্ষ্যভেদের অভ্যাস।

সে সময় নবদ্বীপে ডাক যেত ঘোড়ার গাড়ীতে কৃষ্ণনগর হয়ে। একদিন রাত্রে কয়েকজন আটক করল সেই গাড়ী রাস্তায়। ডাকের রক্ষীর হাতে গুলি লেগে জখম হল। তাকে হাস-পাতালে নিয়ে যাওয়া হল। পরের দিন সকালে সেনের পিতা যখন অস্ত্রোপচার করে বিদ্ধ গুলি বের করছিলেন আততায়ী সেন এই রক্ষীর সামনে দাড়িয়ে থাকলেও সে তাঁকে চিন্‌তে পারেনি। ধরা পড়ে গেল কয়েকজন গুণ্ডা ও নিরপরাধীরা। পুলিস ভাবতেই পারেনি যে এর সঙ্গে কোন রাজনৈতিক যোগাযোগ আছে। সন্ত্রাসবাদে দীক্ষিতদের মধ্যে খুব অল্প কয়েকজনই বেশীদিন পুলিশের কৃপাদৃষ্টি এড়িয়ে চলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সুচতুর ধরপাকড়ে পুলিসের কর্মনৈপুণ্যই ছিল না পুরোপুরি দায়ী। এই সন্ত্রাসবাদ আমাদের দেশের দুর্বল স্নায়ু ও সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী এবং ইংরাজ সম্রাট্‌এর বিশ্বস্ত ও অনুগত প্রজাবর্গের অনেককে ভীত ও মর্ম্মাহত করায় তাঁরা সন্দেহভাজন কাউকে দেখলেই পুলিসে খবর দেওয়া তাঁদের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য বলে মনে করতেন এবং এঁদের নজরে এড়িয়ে কাজ করা বিপ্লবীদের সব সময় সম্ভব হয়নি। পুলিশের বিস্তৃত জালে সন্দেহের কারণে সেন একদিন ধরা পড়ে গেলেন। কিন্তু বাস্তব প্রমাণের অভাবে তাঁকে প্রথম শিবচর ও পরে ফরিদপুর জেলে অন্তরীন রাখা হয়। ১৯২৭-এ জেল থেকে বি, এ পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য্য হয়ে সেন পিতার ও কৃষ্ণ কলেজের প্রিন্সিপালের সাহায্যে নানা চেষ্টায় বিলেতে সিভিল সার্ভিস পড়ার ও পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেয়ে সাগর পাড়ি দিলেন। দেশের সরকার ভাবল দুষ্মনের বুঝি এতদিনে সুমতি হল। সেন তখন রোমান্টিক স্বপ্ন দেখছেন যে সিভিল সার্ভিস পেয়ে তিনি সুভাষ বোসের মতন তাকে প্রত্যা-খ্যান করে আর একটি বঙ্গ-সন্তানের দৃঢ় চরিত্রের উদাহরণ দেখাবেন। কিন্তু তাঁর এ আশা পূর্ণ হলনা। কারণ প্রথমবারে পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়ে দ্বিতীয় বার তিনি যখন আবার প্রস্তুত হয়েছেন তাঁকে সংক্ষেপে জানিয়ে দেওয়া হল যে পরীক্ষার্থীদের সম্বন্ধে নিয়মের ৬ নম্বর আইন অনুযায়ী তিনি এই পরীক্ষার অযোগ্য পাত্র প্রমাণিত হয়েছেন। ছয় নম্বর আইনে লেখা ছিল bad character। ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট সেন ঠিক করলেন যে ছয় নম্বরের আইনে তাঁর যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাকে কাজে পরিণত করতে হবে। ইতিমধ্যে বার্লিন থেকে তাঁর কাছে ঘন ঘন আমন্ত্রণ আসছিল দুটি নাম করা ভারতীয় বিপ্লবীর কাছ থেকে। নলিনী গুপ্ত ও সৌমেন ঠাকুর-এর সঙ্গে তাঁর কলিকাতায় বোমার মাল মশলা সরবরাহে আলাপ পরিচয় আগেই হয়েছিল। এখন তাঁরা বার্লিনে বসে ব্রিটিশ সামরিক শক্তির সঙ্গে একটি বোঝা-পড়া করবার প্রচেষ্টায় উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। বার্লিনে পৌঁছে এঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সেন জানালেন যে এক জার্মান অস্ত্রব্যবসায়ীর সঙ্গে ব্যবস্থা করা হয়েছে যে তিনি ধারে ভারতে অস্ত্র আমদানী করবেন এবং দেশ স্বাধীন হলে পরে তাঁর ঋণ শোধের ব্যবস্থা করা হবে। নমুনা হিসাবে এঁরা সেনের হাতে দুটি ছোট ও চেষ্টা ধরণের হলেও বেশ সক্ষম এমন

দুটি রিভলবার দিয়ে অনুরোধ করলেন যে যেমন করেই হোক এই অস্ত্র দুটি দেশের বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। নমুনাদুটিকে ওভারকোটের পকেটে ফেলে সেন চললেন লণ্ডনে। ট্রেন জার্মানি ও ফরাসী পৌঁছে থামলে ফরাসী কাষ্টম অফিসার তাঁর ছোট স্যুটকেশটা পরীক্ষা না করেই খড়ির দাগ মেরে ছাড়পত্র দিল সেন ভাবলেন একটা বিরাট সমস্যার শেষ হল। কিন্তু পরক্ষনেই সিকিউরিটি পুলিসের একদল এসে তাঁর কামরা ঘিরে ফেলল এবং তাদের অফিসার খানা তল্লাসী করতে ওভার কোটের পকেট থেকে বেরুল অতি নিরীহ চেহারার রিভলবার দুটি। সেন গ্রেপ্তার হয়ে ষ্টেসনে তাদের অফিসে গেলেন। কিন্তু অফিসারটি জেরার চেয়ে যেন সহানুভূতিতে ভরা উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। বল্লেন "তোমরা কেন এই বৃথা চেষ্টা করছ, কারণ কয়েকটা রিভলবার দেশে চালান করে ইংরাজের বিরাট সামরিক শক্তিকে তোমরা হটাতে সক্ষম হবে এ ভাবাই বাতুলতা। তাছাড়া তোমাদের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জাতভাই বিশ্বাসঘাতকেরা। তুমি যে মালশুদ্ধ ধরা পড়লে এ তাদেরই ছলনায়। ফরাসী জাতির ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতি কোন বিদ্বেষ নেই। তাই যদিও আইনত তোমাকে এই অপরাধের জন্য জেলে পাঠানো উচিত আমি তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি। ব্রিটেনের বন্দরে পৌঁছালে ইংরেজ পুলিস তোমার যথাযথ ব্যবস্থার জন্যে তৈরী হয়ে আছে।" এই বলে অফিসারটি সেনের রিভলবারদুটি বাজেয়াপ্ত করে ট্রেনে উঠবার হুকুম দিলেন। ব্রিটিশ বন্দরে পৌঁছাতেই পুলিস সেনের পাসপোর্টটি কেড়ে নিল কিন্তু গ্রেপ্তার করল না। তাঁর বুঝতে বাকি রইলনা যে এখন তারা তাঁকে নজরে রেখে জানতে চাইবে তাঁর সহকর্মী আর কেউ এই কাজে লিপ্ত আছে কিনা।

লণ্ডনে সেন-এর সঙ্গে গুহ নামে এক বাঙ্গালি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেনের ঘরে এসে গল্প করে অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরতেন। সেন মাঝে মাঝে গুহকে খিচুড়ী রান্না করে খাওয়াতেন। বন্ধুমহলে তাঁর হাতের রান্নার খুব প্রশংসা ছিল। গুহ ছিলেন রীতিমত মদ্যপ। একদিন বেশ মত্ত অবস্থায় সেনের কামরায় উপস্থিত হয়ে দারুন ভাবে কাঁদতে শুরু করে দিলেন। হতবাক সেন ভাবলেন ভদ্রলোক নেশার ঘোরে এমন কান্না-পাগল হয়ে পড়েছেন। তাঁর কান্নার বেগ কিছুটা প্রশমিত হলে তিনি সেনকে বল্লেন "আপনি আমাকে এ ভাবে ছেলেমানুষের মত কাঁদতে দেখে নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য্য হয়েছেন।" সেন জানালেন, মানুষ মনে কষ্ট পেলে কেঁদে থাকে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই কেবল তিনি চান যে, যে কারণে তাঁর মনোবেদনা উপস্থিত হয়েছে তার থেকে অব্যাহতি পেয়ে তিনি যেন শান্তি লাভ করেন। ভদ্রলোক তখন কান্নার উচ্ছ্বাস আরো বাড়িয়ে বল্লেন "আজ আপনার কাছে একটা দারুন অপরাধের স্বীকারোক্তি করতে এসেছি কিন্তু কাপুরুষ আমি এখনোও বলবার সাহস পাচ্ছিনা বলেই কেঁদে ঢাকবার চেষ্টা করছি আমার অক্ষমতাকে। অনেক আরো ভনিতা করার পর ভদ্রলোক যে কাহিনী সেনকে শোনালেন তাতে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

গুহ দেশে বমকেসে জড়িত কয়েকজন কর্মীদের জানতেন এবং পুলিস সে খবর পেয়ে নানা প্রলোভন ও ভয় দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে তাঁদের নাম ঠিকানা জেনে গ্রেপ্তার করে ফেলে। এই সৎকার্য্যের জন্য সরকার থেকে ব্যবস্থা করে গুহকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিলেতে এবং তাদের সুপারিসে তিনি রোলস্ রয়েস্-এর কারখানায় মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং শেখবার সুযোগ পান। এর আগে আর কোন ভারতবাসীর ভাগ্যে এত দুর্লভ সুযোগ জোটেনি। কর্মীদের পুলিসে ধরিয়ে দেওয়ার পর তিনি দেশে থাকলে অপর কর্ম্মীরা যে তাঁর পঞ্চত্বের ব্যবস্থা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। গুহ অবশ্য পুলিসের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন যে ভবিষ্যতে তাঁকে এধরনের ফেউ-এর কাজে আর ডাকা হবে না। কিন্তু লণ্ডনে



আসতে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে একদিন গুহর ডাক পড়ল এবং তাঁকে বলা হল যে একটি ভারতীয় ছাত্রের গতিবিধি সম্বন্ধে নজর রেখে তাঁকে বরাবর পুলিসে খবর জানাতে হবে। তিনি তাদের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করলে তারা বলল এ'ত কিছু শক্ত বা বিপদজনক কাজ নয়। তাঁকে যেমন করে হোক সেনের বন্ধু হতে হবে এবং তার সঙ্গে যতদূর সম্ভব সাহচর্য্য করে প্রতিদিন রাত্রে বাড়ী ফেরার পথে পুলিসের অফিসে গিয়ে কেবল মুখে বলে দেবেন কথোপ-কথনের মোটামুটি ভাষ্য ও অতিথি কেউ এসে থাকলে তাঁদের নাম ও পরিচয়। সেন ভারতে নিষিদ্ধ এমন বহু রাষ্ট্রবিপ্লবী ও রাজনৈতিক বই সাধারণ পত্রিকা ও রোমাঞ্চক কাহিনীমূলক বই-এর মলাটে ঢেকে দেশের গণ্যমান্য লোকেদের নাম দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। বাক্সয় ভরা এই বইগুলি নেহেরু, ডাঃ রাধাকৃষ্ণন, মালবিয়া, ডাঃ বিধান রায় প্রভৃতির নামে পাঠালেও পৌঁছে যেত ঠিক দেশের গুপ্ত সমিতির সদস্যদের হাতে। কিন্তু গুহ একদিন দেখেছিল সেনের ঘরে এমনি একটি পাঠাবার জন্য তৈরী বাক্স। তারপর সেন যতগুলি বাক্স ভারতে পাঠিয়েছিলেন গুহের কাছে এই প্রথম জানলেন যে সেগুলি গন্তব্য স্থানে পৌঁছায়নি। তিনি সেনকে বল্লেন "এই ভাবে গত ন' মাস আপনার বন্ধুত্ব ও আতিথ্য গ্রহণ করে প্রতিদিন দেশদ্রোহিতা বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছি। এখন আপনার সামনে আমি দাঁড়িয়েছি উপযুক্ত শাস্তি পাবার জন্যে তৈরী।" এরকমের নিকৃষ্ট বিশ্বাসঘাতকের পরিচয় মেলে বইয়ের লেখায়। বাস্তবে তার সম্মুখীন হয়ে সেনের মনে হল যেন এক বীভৎস জানোয়ার তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে। তিনি শুধু বলতে পারলেন "মশায় অনুগ্রহ করে এখন আমার ঘর ছেড়ে বাড়ী যান।" গুহ জিজ্ঞাসা করলেন আর তিনি বোধ হয় তাঁর কামরায় আসতে পারবেন না। সেন বল্লেন "না তা কেন। আপনি যেমন আসছিলেন তেমনি আসুন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে এই কাজের জন্যে আপনাকে যে ইনাম দেওয়া হয় তার থেকে আপনাকে আমি বঞ্চিত করতে চাই না। আপনি না এলে আমার অন্য বন্ধুদের আমি সন্দেহ করতে আরম্ভ করব যে তাদের মধ্যে রয়ে গেছে কিনা আপনার আরও সংস্করণ। তাই সন্দেহটা বদ্ধ থেকে যাক একজনেরই উপর।"

যে জাতীয় সংগ্রামের অভিযান দেশে চলেছিল তারই তরঙ্গ প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে এনেছিল নব আশার বার্তা, উদ্যম ও সংকল্প। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক গোষ্ঠির সান্নিধ্যে এসে তাঁরা গড়েছিলেন শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সর্বাঙ্গীন রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন এক বিরাট ছাত্র সমাজ। সাকলাতওয়ালা প্রমুখ স্বরাজ্য সংগ্রামের অগ্রদূতেরা প্রবাসী ছাত্রদের সামনে তুলে ধরেছিলেন একটা পরিষ্ফুট রাজনৈতিক চিন্তা ও আদর্শ। ১৯০০ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত ভারতীয় সাম্যবাদী ছাত্র সমিতি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের ভারত শাসন প্রণালীর ওপর অবিরত ও তীব্র আক্রমণ চালিয়ে যান। এই সময় লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স এসো-সিয়েশন গঠিত হয় ডাঃ মুলুক্‌রাজআনন্দ হন তার সেক্রেটারী। বেন্ ব্রাড্‌লে, হাচিনসন ও ফিলিপ প্রাট্‌এর মত মিরাট ষড়যন্ত্রের কম্যুনিষ্ট অধিনায়করা ভারতীয় ছাত্রদের হাতে সম্পূর্ণ নেতৃত্ব ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন না। শেষে তাদের এই ধরণের মোড়ালদারী না সহ্য করতে পেরে ভারতীয় ছাত্ররা নিজেরা স্বতন্ত্র দল গঠন করেন এবং ঠিক হয় যে পারী সহরে তাঁরা কার্য পরিচালনার কেন্দ্র স্থাপন করবেন।

সেন লণ্ডনে আধবেলা ডাঃ সিন্‌হার বই-এর দোকানে কাজ করতেন। এখানে বই বেচা ও পড়া দু'কাজই একসাথে হোত। আর আধবেলা ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে গবেষণামূলক পড়াশুনা করে ও বাকী সময়টা রাজনৈতিক কাজে তিনি ব্যস্ত থাকতেন। এখন তিনি লণ্ডনের পাট উঠিয়ে পারীতে এসেছেন নতুন কেন্দ্রের কাজে। পারীতে সেন-এর কয়েকজন বন্ধু তাঁকে

একবার জানান যে পলাতক মানবেন্দ্র রায় দেশে ফিরতে চান তার জন্যে একটা পাশপোর্টের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ অন্য কারুর পাশপোর্ট নিয়ে জাল মানুষ সেজে দেশে ঢোকবার চেষ্টা করতে হবে। সেন তখন লুব্ধ পকেট মারের মত ওত্ পেতে থাকতেন কার কাছ থেকে এই অমূল্য ছাড়পত্রটি হস্তগত করা যায়। তাও আবার এমন লোকের পাশপোর্ট হওয়া চাই যার সঙ্গে জাল অধিকারীর খানিকটা যাতে সাদৃশ্য থাকে। উপায় মিল্‌লো এক অপ্রত্যাশিত ভাবে। লণ্ডন থেকে আগত একজন ভারতীয় সেন ও আর কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে গিয়েছিলেন ভেয়ারসাই দেখতে। সেখানে একটি কাফেতে তিনি বাথরুমে যাবার সময় সেনকে তাঁর রেন কোট-টা রাখতে বললেন। বেশ নিপুণ পকেটমারের মত কোটের পকেটগুলি হাতড়াতে সেন পেয়ে গেলেন ভদ্রলোকের পাশপোর্টখানা। কোন এক ওজর দিয়ে অপর একজনের জিম্মায় কোটটি দিয়ে সেন তখন ছুটেছেন পারীর গাড়ী ধরতে। সেই পাশপোর্ট নিয়ে মানবেন্দ্র রায় ফেরেন ভারতে এবং প্রায় দেড় বছর পরে যখন তিনি ধরা পড়েন তখনও সেই পাসপোর্টের অধিকারীর জাল নামেই তিনি পরিচিত।

সেনকে একদিন প্রশ্ন করলাম, তিনি কেন আমাকে তাঁর দলে টানবার কোন চেষ্টা করেননা যেমন তাঁকে তাঁর সহকর্মীরা টেনে নিয়েছিল। তাঁর উত্তর এল "আমাকে কেউ তো টানে নি। রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমার মনকে তৈরী করেছিল এবং এই ভাবে যাদের মন হয়েছিল সজাগ তারা নানা যোগাযোগে জোট বেঁধেছিল কারণ তাদের উদ্দেশ্যটা ছিল একই ধরনের। আপনি শিল্পী আপনি থাকবেন শিল্পের কেন্দ্রে শিল্পীদের সঙ্গে। আপনাকে একটা বিপ্লবী বা সোলজারে পরিণত করা মানে দেশের ক্ষতি করা। স্বাধীনতা আনব আমরা লড়াই করে কিন্তু তার প্রতিষ্ঠায় গড়বার কাজে প্রয়োজন হবে শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিকদের। আমাদের বন্ধুত্ব ও দেশাত্মবোধটা থাক একত্র কিন্তু আমাদের পেশাটা রেখে দেব স্বতন্ত্র।" এরপর মাসের পর মাস কেটে গেল সেনের সান্নিধ্যে কিন্তু আমাদের শিল্প ও সাহিত্য ছাড়া রাজনৈতিক প্রসঙ্গের আলোচনা আর হয়নি।

## আ লো চ না

### বৌদ্ধতন্ত্র ও চড়ক

তন্ত্রশাস্ত্রের দিক থেকে হিন্দুতন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধতন্ত্রও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দুতন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধতন্ত্রেরও অসংখ্য গ্রন্থ আছে। মূল 'কল্পতরু' এবং 'সমাজতন্ত্র' নামে দু'খানি প্রাচীনতম বৌদ্ধতন্ত্র রচিত হয় প্রথম ও তৃতীয় শতাব্দীতে। চীনদেশীয় ত্রিপিটকে চীনা ও তিব্বতী ভাষায় অনুদিত কয়েকখানি তন্ত্রগ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নালন্দা ও বিক্রমশীলা বৌদ্ধ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে একসময় তন্ত্রশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হতো। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ এ সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করে ইতিপূর্বে বিদগ্ধ বাঙ্গালী পাঠকসমাজের অনুসন্ধিৎসা মেটাবার প্রয়াস পেয়েছেন। বাংলা দেশেই সর্বপ্রথম বৌদ্ধতন্ত্র সমৃদ্ধ হয়। ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য তাঁর 'Introduction to Buddhist Esotericism' গ্রন্থে দেখিয়েছেন—কিভাবে হিন্দুতন্ত্র নানা বিষয়ে বৌদ্ধতন্ত্রের নিকট ঋণী। হিন্দুতন্ত্রে দশমহাবিদ্যার যে বর্ণনা আছে, তা প্রধানত বৌদ্ধতন্ত্র থেকেই গৃহীত। বৌদ্ধতন্ত্র 'সাধনমালা' তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী, ভদ্রকালী এবং তারাদেবীর এই অষ্টরূপের মন্ত্রাবলীও বৌদ্ধতন্ত্র থেকে প্রাপ্ত। সরস্বতী ও কালী — বাংলার এই জনপ্রিয় দেবীদ্বয়ও বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টি। হিন্দুতন্ত্রের অনেক মন্ত্র বৌদ্ধতন্ত্রসৃষ্ট মন্ত্রের অপভ্রংশ। বৌদ্ধধর্ম্মের পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের এক একটি শক্তি আছে। তাঁদের নাম—লোচনা, যানকী, পাণ্ডারা, আর্য্যতারা ও বজ্র-ধাত্রীশ্বরী। হিন্দুতন্ত্রে যেমন বামাচার ও দক্ষিণাচার—এই দুটি বিভাগ আছে, বৌদ্ধতন্ত্রেরও তদ্রূপ ক্রিয়াতন্ত্র, চর্য্যাতন্ত্র ও যোগতন্ত্র প্রভৃতি চারটি বিভাগ আছে। বৌদ্ধতন্ত্রমতে মহাশূন্য থেকে বীজমন্ত্রের সৃষ্টি হয়, এবং এক একটি বীজমন্ত্র এক একটি দেবতার রূপ ধারণ করে। মোটামুটি চুরাশি জন সিদ্ধপুরুষের নাম পাওয়া যায় বৌদ্ধতন্ত্রে। তাঁরা সপ্তম, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়ে সান্ধ্য ভাষায় তন্ত্র প্রচার করেন।

এই বৌদ্ধতন্ত্র বা বজ্রযান তৃতীয় শতাব্দীতে মৈত্রেয়নাথ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। কামাখ্যা ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রাচীন কেন্দ্র ছিল। হিন্দুতন্ত্রে যেমন আগম ও যামল নামে দুটি ভাগ আছে, বৌদ্ধতন্ত্রের তেমনি বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান নামে তিনটি প্রধান বিভাগ আছে। কালচক্রযানের বিস্তৃত দর্শন ও ইতিহাস তিব্বতী ভাষায় রুশীয় বৌদ্ধতত্ত্ববিদ ডাঃ জর্জ্জ রোরিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। বৌদ্ধ সরস্বতীর মূর্ত্তিতে দেখা যায় — তিনটি মুখ ও দুটি হাত। বৌদ্ধজগতে বাগীশ্বরী মঞ্জুশ্রীর শক্তি সরস্বতী। 'সাধনমালা' নামক বৌদ্ধতন্ত্রে মহাসরস্বতী, বজ্রবীণা সরস্বতী, বজ্রসারদা ও আর্য্য সরস্বতীর ধ্যান আছে। 'সাধনমালা'য় মহাসরস্বতীর বর্ণনা এইরূপ : 'ভগবতী, শরদিন্দুকরাকারা, সিতকমলোপরি চন্দ্রমণ্ডলস্থা, স্মেরমুখী, অতিকরুণাময়ী, শ্বেতচন্দন-কুসুম-বসনধরা মুক্তাহারোপশোভিত-হৃদয়া, নানালঙ্কারবতী, দ্বাদশবর্ষাকৃতি, স্ফুরদনন্তগভাস্তি ও ব্যুহাবভাসিতলোকত্রয়া।'

তেমনি চড়কেও বৌদ্ধপ্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পূর্বে ধর্ম্ম বা ধর্ম্মনিরঞ্জন এ উৎ-সবের আধিদেবতা ছিলেন। তিনিই আদি বুদ্ধ 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থে বুদ্ধদেব ধর্ম্মরূপে

অভিহিত হয়েছেন। রাঢ় অঞ্চলে ধর্ম্মই গাজনের প্রধান দেবতা। বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের যুগে বল্লুকা নদীর তীর থেকে ধর্ম্মশীলা উত্তোলন করে বাসাই পণ্ডিত ধর্ম্মপূজার প্রবর্ত্তন করেন। এইভাবে সদ্ধর্ম্মী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। নব ব্রাহ্মণ্যধর্মের চাপে বৌদ্ধগণ 'সদ্ধর্ম' সৃষ্টি করে তাতে আত্মগোপন করেছিলেন। আদি বুদ্ধ বা ধর্ম্মনিরঞ্জন বহুকাল যাবৎ ধর্মপূজার ও গাজন উৎসবের আধিদেবতা ছিলেন; কিন্তু শৈবধর্মের চাপে তিনি গাজন উৎসব থেকে স্থানচ্যুত হলেন। কোনও স্থানে তিনি আদি বুদ্ধজাত এবং কোনও কোনও স্থানে তিনি আদি বুদ্ধ থেকে স্বতন্ত্র বলে বিবেচিত হতে লাগলেন। 'ধর্মপূজাপদ্ধতি' নামক সংস্কৃত পুঁথি থেকে জানা যায় যে, আদ্যাশক্তি চণ্ডিকা আদি বুদ্ধকণ্যা। এই আদি বুদ্ধকণ্যা আদ্যা পার্ব্বতীর সঙ্গে সদাশিবের বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলে সদাশিব গৌরীকে বামে নিয়ে গাজনে বসলেন এবং এই ভাবে কোনক্রমে ধর্মনিরঞ্জন ধর্মপূজার পরিমণ্ডলের প্রধানপদ হারালেন। কোথাও কোথাও দেখা যায়, ধর্মনিরঞ্জন শিবের গাজনে নিমন্ত্রিত হয়েছেন। উৎকলের 'ধর্ম গীতা' অনুসারে ধর্ম আদি বুদ্ধের পুত্রস্থানীয়। এই গ্রন্থানুসারে নিরঞ্জন ধর্ম থেকে পৃথক। ধর্ম্ম-দেবতার কোনও মূর্ত্তি সচরাচর দৃষ্ট হয় না। রাঢ় অঞ্চলে কুর্ম্মাকৃতি প্রস্তরখণ্ডের উপর শ্বেত-চন্দনের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মপদ অঙ্কিত করে ধর্ম্মপূজা করা হয়। একে ধর্ম্মপাদুকা বলে। কুর্ম্ম দশাবতারের অন্যতম। কুর্ম্ম ধর্ম্মশরীর থেকে উৎপন্ন বলে কথিত হয়। এ জন্য সদ্ধর্ম্মীরা কুর্ম্মরূপী ধর্ম্মের পূজা করতেন। কিন্তু শিব শেষকালে ধর্ম্মের গাজনের অধিদেবতা হলেন।

ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে শ্রীযতীন্দ্র সেন প্রমুখ দু'একজন চিন্তাবিদ এ সম্পর্কে নানা বিষয় সংগ্রহ করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, বৌদ্ধগণের 'ধর্ম্ম' প্রধানত স্ত্রীরূপী। বৌদ্ধ 'ত্রিরত্ন' অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ হীনযান ও মহাযান — এই উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তিভাজন। ধর্ম্ম স্ত্রীমূর্ত্তিতে বুদ্ধের বামে এবং সঙ্ঘ পুরুষ মূর্ত্তিতে তাঁর দক্ষিণে বসলেন। তবে এ কথা সর্ব্বত্র সত্য ব'লে ধ'রে নেওয়া কঠিন। কারণ নানারূপ জটিলতার এবং বহু ধর্ম্মগত ও পদ্ধতির মিশ্রণে ধর্ম্মের গাজনের ইতিহাস পরিষ্কার ভাবে উদ্ধার করা দুরূহ। বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধ প্রভৃতি বুদ্ধ ও তাঁদের সঙ্গে যথাক্রমে বজ্রধাতেশ্বরী, লোচনী, মানুষী, পাণ্ডুরা ও তারা নাম্নী বুদ্ধ শক্তিগণ এবং সমন্তভদ্র, বজ্রপানি, রত্নপানি, পদ্মপানি ও বিশ্বপানি নামক বোধিসত্ত্বগণের আবির্ভাবের সঙ্গে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার বৈচিত্র্য সাধিত হলো। মস্তকে অমিতাভ বুদ্ধধৃত অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তির জটামধ্যে গঙ্গাসমন্বিত মহাদেবের সঙ্গে অপূর্ব সাদৃশ রয়েছে। বোধিবৃক্ষতলে পদ্মাসনে উপবিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, চতুর্হস্ত, ত্রিনেত্রবিশিষ্ট, চন্দ্রকলাশোভিত, জটাজুট সমন্বিত ও সর্পবিভূষিত লোকেশ্বর বুদ্ধের মূর্ত্তিও শিবের অনুরূপ বলে পরবর্ত্তী-কালে এঁরও শিবত্ব প্রাপ্তির পক্ষে সুবিধে হয়েছিল। অনেকে অনুমান করেন, হিন্দুধর্ম্মে মূর্ত্তি পূজার প্রচলন বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকরণে প্রচলিত হয়ে থাকবে। এই ভাবে নানা বৌদ্ধ উৎসবও শৈব উৎসবে পরিণতিলাভ করেছে। গাজন তার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

কান্যকুব্জে মহারাজা হর্ষবর্দ্ধন চীন পর্য্যটক হুয়ান চুয়াং-এর সম্বর্দ্ধনার জন্য চৈত্রোৎসব অনুষ্ঠান করেন। এই উৎসবক্ষেত্রে নৃত্যগীত ও বাদ্যের বিপুল আয়োজন হয়। একশো ফিট উঁচু মণ্ডপগৃহে মানুষের সমান উচ্চতাবিশিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত হয়। বহু জৈন, বৌদ্ধ, শ্রমণ, ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ এই উৎসবে সমবেত হন। মহারাজ একটি সুবর্ণময় বুদ্ধ-মূর্ত্তি স্কন্ধে করে নদীতে নিয়ে স্নান করিয়ে উৎসব মণ্ডপে আনয়ন করেন। এরপর থেকে এই উৎসব প্রতিবছর চৈত্রমাসে অনুষ্ঠিত হয়ে চৈত্রোৎসবে পরিণত হয়। এই বুদ্ধমূর্ত্তি স্নানের সঙ্গে ধর্ম্মের আসনের বা পাটের স্নানের সাদৃশ্য আছে। ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ



বশতঃ একবার মুণ্ডিতমস্তক 'নেড়া' বৌদ্ধগণকে পুড়িয়ে মারবার জন্য উৎসবগৃহে অগ্নিসংযোগ করেছিলেন। এই ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ চড়কের 'নেড়া পোড়া' ব্যাপারটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। চীন-পর্য্যটক ফা-হিয়ান মহারাজা হর্ষবর্দ্ধনের আর একটি বৌদ্ধ উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন। এই উৎসব প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ মাসে অনুষ্ঠিত হতো। রথের উপর বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি উপবিষ্ট করিয়ে হাতী ও ঘোড়া সহযোগে রাজপথ সমূহ ভ্রমণ করা হতো। কুড়িজন সামন্তরাজা কুড়িখানি রথে আরোহন করে শোভাযাত্রায় যোগ দিতেন। এই শোভাযাত্রায় প্রায় আটশো হাতী থাকতো। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ছাড়া আরও বহু হিন্দু দেব দেবীর মূর্ত্তিও এই শোভাযাত্রায় থাকতো। পুষ্পমাল্য ও পতাকাশোভিত রথের মধ্যে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি উপবিষ্ট থাকতো, আর সারথিবেশে বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি রথের সম্মুখে স্থাপিত হতো। বহু দূরপল্লী ও জনপদ থেকে বহু নরনারী এই ধর্ম্ম-উৎসব দর্শনে আসতো ও বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান ক'রতো। মহারাজা শিলাদিত্যের আহ্বানক্রমেও প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমক্ষেত্রে অনুরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হ'তো। এই সব বৌদ্ধ উৎসব কালক্রমে ধর্ম্মের ও শিবের গাজনে পরিণত হ'য়ে আধুনিককাল পর্য্যন্ত চ'লে আসচে।

**রণজিৎকুমার সেন**

## স মা জ স ম স্যা

### ভবিষ্যতের জন্য

ইতিহাসের উষাকাল থেকে মানুষ ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছে। আশা করেছে যে বর্ত্তমানের দুঃখ দুর্দশার মেঘ কেটে গিয়ে ভবিষ্যতের সোনালী দিন আলোয় ঝল্‌মল্‌ করে উঠবে। আর এই ভরসাতেই ভবিষ্যতের সুখের জন্য সে বর্ত্তমানের দুঃখকে হাসিমুখে বরণ করেছে; ত্যাগ করেছে আপাতমধুর তৃপ্তির উপভোগ্য প্রলোভনকে।

কিন্তু ত্যাগ শুধু সে স্বেচ্ছাতেই করেনি। ভবিষ্যতের সোনালী স্বপ্ন দেখিয়ে তার বর্ত্তমানের মুখের গ্রাস ছিনিয়েও নিয়ে যাওয়া হয়েছে — ইতিহাসে এ সাক্ষ্যও বড় কম নেই। পরলোকতত্ত্বের গোড়াতেই রয়েছে ভবিষ্যতের চিরসুখের প্রতিশ্রুতি, আর সেই স্বর্গসুখের প্রলোভনেই যুগযুগ ধরে মর্ত্তমানুষের স্বেদ আর অশ্রুর বিনিময়ে অর্জিত অর্থ পুরোহিত, ধর্ম্মসঙ্ঘ, গির্জ্জা আর মস্‌জিদের প্রতিপত্তির সৌধ গড়ে তোলবার জন্য স্রোতের মত গিয়ে জমা হয়েছে। এ যুগেও বহু দেশেই দেখা গেছে যে সাধারণের ক্ষুধার সামান্য অন্নের পর্য্যন্ত সিংহভাগ ছিনিয়ে নিয়ে রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে তার সামরিক শক্তি বা চোখ ঝল্‌সান ভারী যন্ত্র-শিল্পের বুনিয়াদ। সেখানেও অজুহাত সেই একই — ভবিষ্যতকে নিরাপদ রাখবার জন্য, অনাগত সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগের জন্য আজকের অর্দ্ধাহার শ্রেয়।

কিন্তু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে এ যুক্তির মূলে কতবড় গলদ লুকিয়ে আছে। ভবিষ্যতের জন্য বর্ত্তমানকে স্বার্থত্যাগ করতেই হবে, একথা তর্কের খাতিরে মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায় সে ভবিষ্যৎ কত দূরের? দশ, পনের, কুড়ি—কতদিন পরে, কত বছরের ব্যবধানে আজকের ত্যাগের মূল্য পাওয়া যাবে? ভাবুকের উদাত্ত কণ্ঠ হয়ত ঘোষণা করবে; দশ পনের, কুড়ি নয়,—তোমার জীবনকালের জন্যও নয়—'ভাবী' যুগের জন্য, উত্তরপুরুষের জন্য। যুক্তিটি আপাত রমণীয়। উত্তরপুরুষের জন্য স্বেচ্ছায় স্বার্থত্যাগ করতে অনেকেই হয়ত রাজী হবেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে, আমরা না হয় উত্তরপুরুষের মুখ চেয়ে স্বার্থত্যাগ করলাম: কিন্তু যাদের জন্য এই ত্যাগ, তারা কতখানি লাভবান হবে?

প্রকৃতপক্ষে সুদূর ভবিষ্যতের জন্য অন্ততঃ আজকের এই গতিশীলতার যুগে অহেতুক কৃচ্ছসাধনের যুক্তি নেই। যারা বলেন, বর্ত্তমানে প্রচণ্ড কষ্টস্বীকার করে ভবিষ্যতের জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি গড়ে তোল, তাদের কথাই ধরা যাক। এঁদের যুক্তি বিশ্লেষণ করলে মূলতঃ এই দাঁড়ায় ঃ আজ আমরা কঠিন শ্রম করে অধিক উৎপাদন করব, কিন্তু তার ফল অবিলম্বে ভোগ না করে এই বর্দ্ধিত সম্পদের অধিকাংশই সঞ্চয় করা হবে। এই সঞ্চয়ের সাহায্যে আমরা দেশে ভারী যন্ত্রশিল্প গড়ে তুলব এবং তার ফলে শিল্পগত শক্তি হিসেবে আমাদের দেশ কালক্রমে উল্লেখ্য হয়ে উঠবে। যথাসময়ে এই শিল্পসমৃদ্ধির জন্য আমাদের উত্তরপুরুষ লাভবান হবে, কারণ শিল্পসমৃদ্ধির ফলে তাদের আয়, উপভোগ্য পণ্য উৎপাদনের শক্তি এবং উপভোগক্ষমতা সবই বেড়ে যাবে। কিন্তু একথা যদি মনে রাখি যে এই বৈজ্ঞানিক প্রগতির যুগে আজকের ব্যবহার্য্য যন্ত্রপাতি, উৎপাদনকৌশল ইত্যাদি সবই আগামীকাল অকেজো তথা বাতিল হয়ে



পড়তে পারে, তবে অতিদূর ভবিষ্যতের শিল্পসমৃদ্ধির জন্য আজকের কষ্টলব্ধ সম্পদ বিনিয়োগের প্রয়োজনাতিরিক্ত অত্যুৎসাহ আর থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ, ভবিষ্যতের জন্য কৃচ্ছসাধন করবার যুক্তির মূলে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সুখদুঃখের এক তুলনা পাওয়া যায়। এই যুক্তি প্রায় স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই ধরে নেয় যে ভবিষ্যতের তৃপ্তি, বর্ত্তমানের তৃপ্তি তথা সুখদুঃখের চাইতে অনেক বেশী মূল্যবান। কিন্তু এই অনুমানের পেছনে কোন নিশ্চয়তা নেই। ভবিষৎ অর্থে যদি উত্তরপুরুষ ধরে নেওয়া যায়, তবে এরকম তুলনা অর্থহীন — কারণ তুলনামূলক মানদণ্ডের অভাবে সমকালীন দুজন মানুষের তৃপ্তির মধ্যে যখন তুলনা করা কঠিন তখন দীর্ঘকালের ব্যবধানে ভিন্ন রুচি, রীতি নীতি, পরিবর্তিত অভ্যাস ও প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে দুইপুরুষ পরম্পরার মধ্যে তৃপ্তি কিম্বা সুখদুঃখের তুলনামূলক বিচার কি ভাবে চলতে পারে? আর যদি নিকট ভবিষ্যৎ, অর্থাৎ এক পুরুষের জীবনকালের কথাও ধরে নেওয়া হয় তবুও ভবিষ্যতের তৃপ্তি বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিকতর কাম্য একথা বলা কঠিন। আজকের তৈরী পিঠে আজ না খেয়ে কাল খেলেই যে আমি বেশী তৃপ্তি পাব, একথা কি খুব নিশ্চিতভাবে বলা চলে?

অবশ্য আমার বক্তব্য এই নয় যে আমি "ঋণং-কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" নীতির বিশেষ ভক্ত; কিম্বা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় বা সংস্থানের প্রয়োজন সম্পূর্ণ অস্বীকার করছি। মানুষকে যখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই উৎপাদন করতে হবে, তখন সেই উৎপাদনের জন্য মূলধনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। আর সঞ্চয় ছাড়া যে মূলধন গড়ে ওঠে না, এও স্বতঃসিদ্ধ। আমাদের মত পেছিয়ে পড়া গরীব দেশে, আয় যখন প্রয়োজনের তুলনায় বেশি না হয়ে বরং অতান্তই কম, সে অবস্থায় এই স্বল্প আয়ের ভেতর থেকেই সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করতে হবে বা আর বাড়াবার জন্য অধিকতর প্রয়াস করতে হবে। এর যে কোনটির ফলেই কৃচ্ছসাধন অবশ্যম্ভাবী। আর বর্ত্তমানের স্থানু অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য, কিছুদিনের জন্য সঞ্চয়ের তথা বিনিয়োগের হার যে বাড়াতে হবে এ সম্বন্ধেও আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু এ সব মেনে নিয়েও একথা ভুলে গেলে চলবে না যে মানুষের কৃচ্ছসাধনেরও একটা সীমা আছে, এবং থাকা বাঞ্ছনীয়। আর সবচেয়ে বড় যে কথাটি আমরা উন্নয়নের অত্যুৎসাহে ভুলে যাই তা হচ্ছে এই যে সেই সীমা নির্দ্ধারণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার যারা কৃচ্ছসাধন করবে তাদের; অন্য কারো নয়। ভবিষ্যতের বা উত্তরপুরুষের জন্য ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন সাধারণ মানুষের দূরদৃষ্টিতেই প্রতিফলিত হতে পারে। সে জন্য তাকে বাধ্য করা বা মিথ্যে প্রলোভন দেখিয়ে প্রবঞ্চনা করা শুধু যে অপ্রয়োজনীয় তাই নয়, জঘন্য অপরাধ। আমাদের শতাব্দীতেই পৃথিবীর অন্ততঃ কয়েকটি দেশে ভবিষ্যতের নাম করে এই প্রবঞ্চনা ও জবরদস্তি আকাশছোঁয়া হয়ে উঠেছে। আমরা যেন তাদের প্রাসাদের বিরাটত্বে অভিভূত হয়ে নীচের তলার অন্ধকার, আর ভিত্তির আর্ত্তনাদ না ভুলে যাই। ভবিষ্যতের জন্য কৃচ্ছসাধন সমর্থনীয় হতে পারে, কিন্তু ততটুকুই, যতদূর পর্য্যন্ত তা মানুষের সামর্থ্যের বা স্বাধীন ইচ্ছার গণ্ডীকে ক্ষমতাসীনের স্পর্দ্ধায় মুছে না দিতে চায়।

**সুব্রতেশ ঘোষ**

## স মা লো চ না

**ঝড় আসবে :—** শ্রীপারাবত। গ্রন্থজগত, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-৩। আড়াই টাকা।

বাংলা সাহিত্যের নামে বাজারে যে চুরি আর কচুরি পরিবেশন চলেছে, সেকথা চিন্তা করে অকুণ্ঠ চিত্তে বলব—রীতিমত আশান্বিত হয়েছি লেখকের কলমে, এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পেলাম তার সাবলীল লেখায়। "ঝড় থামবে" তাই নোতুন কলমে এক সরেস উপাখ্যান।

তবু উপন্যাসের উঠোনে যখন লেখক সাহসে ভর দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেনই তখন উপন্যাসের বর্তমান দুর্দশার দু'একটা কথা না বলে পারছি না। আজ বাংলা উপন্যাসের দিকে লক্ষ্য করলে স্পষ্ট দু'টো ভাগ চোখে পড়ে। একদল লেখক আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস রচনা সুরু করেছেন। ব্যক্তিকে পূর্ণ প্রসারিত করতে গিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রকে প্রায় ভুলে যান। এবং সেই সঙ্গে তাঁরা তাঁদের একচক্ষু হরিণের মত দেখা জগতটাকেই একমাত্র সত্য বলে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে উঠে পড়ে লেগে যান। অপর দল সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা সমাজ আর ইতিহাস দেখবার নামে যৌন-মশলা দিয়ে বাজারে এমন সব দিদি-বৌদি, সাহেব-গোলামদের ছেড়ে দিয়েছেন যে, আমরা সারা সমাজ ঘেঁটেও সে সব চরিত্রের হদিস্ সাধারণত পাই না। (বিশ্ব নিন্দুকরা বলেন, ওরা নাকি বিদেশী পাড়ার মানুষ!) তাই আশ্চর্য হয়ে যাই, যখন দেখি—এই সব প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকরা তাঁদের সাহিত্যের মুদিখানায় "সম"কে "সম" করার সমীকরণ জানেন, অথচ এদেশেরই ধুলো-মাটি মাখা মানুষগুলোকে নিয়ে তাঁরা ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রের সমীকরণ করতে জানেন না। অবশ্য তৃতীয় একদল এসে মাঝে মাঝে সে-সমীকরণ করার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু হয় তাঁরা অল্পদিনেই ফুরিয়ে যান অভিজ্ঞতার অভাবে, নয়ত শিল্প-বোধের অভাবে তাঁদের উপন্যাসকে সার্বজনীন করে তুলতে পারেন না।

তৃতীয়দলের একজন সার্থক আগন্তুক হিসেবে যদি "ঝড় থামবে"র লেখককে পেতাম, তবে খুসীই হতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার উপন্যাসের এমন কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি চোখে পড়ল, যা উল্লেখ না করে পারা গেল না। প্রথম কথা, লেখাটিকে উপন্যাস হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধা আছে। বইয়ের নায়ক, বিন্দুদার সদরপুরের গ্রাম্যজীবন থেকে কলকাতায় একশো পাঁচ নম্বর বস্তির বাসিন্দা পর্যন্ত, মধ্যবিত্ত জীবন-ভাঙ্গনের যত বড় সত্য কাহিনীই থাকুক না কেন, স্থানে স্থানে তার স্কেচ্‌গুলো দানা বেঁধে উপন্যাসের কোঠায় পৌঁছুতে পারে নি। তাছাড়া কলকাতা জীবনের স্কেচ্‌গুলো কেমন যেন 'মেকানিকাল' হয়ে গেছে। ধাপার মাঠের পাশে হিউজেস্ রোডের বাগানে যে রজনীগন্ধা ফোটে, তার ক্রেতাদের নিয়ে একটু বেশী মাত্রায় নাটকীয়তা হয়ে যায়নি কি! কুণ্ঠরোগী মদনের কাছে খাদ্যের চেয়ে ফুলের দাম যত বেশীই হোক না কেন, লেখকের এই নোতুন কোণ থেকে সৌন্দর্য-দর্শনের চেষ্টা একেবারেই অবাস্তব। লেখাতে গোঁসাইজীকে যেরকম প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তদনুযায়ী তাঁর ভূমিকার গুরুত্ব সেরকম উপলব্ধি করতে পারলাম না। তাছাড়া নায়িকা ছবি তার নুলো শিব পূজোর মধ্যদিয়ে কলকাতার অভিজাত পাড়াতেও যে দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত প্রেমের জয়গান দেখিয়েছে, তাতে লেখকের দুর্বলতাই ধরা পড়েছে বেশী।



তবুও বলব, এরকম দু'চারটে ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা ছেড়ে দিলে, শ্রীপারাবতের "ঝড় থামবে" বইটি নিঃসন্দেহে চলতি বাজারের প্রথম শ্রেণীর লেখকদের বহু লেখার চাইতেই শ্রেষ্ঠ। তদুপরি এক নোতুন স্বাদ পেলাম বইটির মুখবন্ধে।

শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত বলিষ্ঠ প্রচ্ছদপটটি বিশেষ লক্ষ্যণীয়। কারণ, সিঙ্ক স্ক্রীণ পদ্ধতিতে মুদ্রিত এক অভিনব রূপারোপ হয়েছে ত্রিবর্ণরঞ্জিত প্রচ্ছদে।

**কুশল মিত্র**

**নাক নিয়ে নাকাল :** শিবরাম চক্রবর্তী : এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী : দাম দুটাকা।

**বোরো বাদুরের ডাক :** ইন্দিরা দেবী : এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী : দাম দু টাকা

দুটো বই-ই কিশোরদের জন্য। দ্বিতীয়টিতে স্পষ্ট করে লেখা আছে 'কিশোর উপন্যাস' আর প্রথমটিতে তেমন কিছু লেখা না-থাকলেও 'ছোটদের জলসায় শিবরামবাবুর আরও কয়েকটি বই লেখা। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় লেখকের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা দেখে। তাঁর বয়স হয়েছে, যশও। এর বিজ্ঞাপন থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে কষ্ট হয় না, "নাক নিয়ে নাকাল" কিশোরদেরই জন্য লেখা তাঁর কাছে আমরা কি এটুকুও আশা করবো না যে কিশোরদের জন্য লেখা বইয়ে থাকবে প্রবীণ লেখকের সংযম?

প্রথম গল্প, একলব্যের মুণ্ডপাত। আরম্ভেই লিখেছেন তিনি,—"সেকালের একলব্য গুরু-দেবকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে (দিয়ে, না দেখিয়ে?) অস্ত্রবিদ্যায় নায়ক হয়েছিল, আমার বন্ধু বটুকও তেমনিধারা এক একলব্য।" কয়েক লাইন পরেই আবার এক মন্তব্য—"গুরুর কাজই হচ্ছে ভক্তের ঘাড়-ভাঙা।" গল্পটিতে literally ঘাড় ভাঙা হয়েছে ভক্তের, এবং ঐ "গাঁজা" টুকুই এ-গল্পের বৈশিষ্ট্য কিন্তু উদ্ধৃত অংশগুলি বাদ দিয়ে শিবরামবাবু যদি গল্পটি পরিবেশন করতেন তাহলে কোন ক্ষতি হত কি? একলব্যের গুরুদক্ষিণার কাহিনীটির যে-মহাত্ম্য আমরা বারবার কিশোরদের মনে গেঁথে দিতে চাই সেটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ "দেখানো" বলে হাস্যরসসৃষ্টি করা ক্ষতিকর নয় কি?

এবার দ্বিতীয় গল্প "লাভপুরের ডিম"। মুরগীকে তাতিয়ে ডিম-পাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে একটা দৃশ্যে। "এক কাজ কর্। তুই ওর সামনে বসে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ কর। যেন তুই আরেকটা মুর্গি; ডিম পাড়ছিস্ কি ডিমে তা দিতে লেগেছিস্।" ইত্যাদি। 'লাভ' কথাটার Pun ও দৃশ্য থেকে আপনাকে রসগ্রহণ করতে হবে এই গল্পে!

তারপর, "নাক নিয়ে নাকাল", যে-নামে বইয়ের নাম। ড্রিল-মাষ্টারকে নিয়ে রঙ্গ করা হয়েছে এই গল্পে, আর দেখানো হয়েছে কেমন করে একটি ছাত্র তাঁকে বেকুফ বানালো হেড-মাষ্টারের কাছে। ড্রিল-মাষ্টার এক জায়গায় ছাত্রটির বিরুদ্ধে হেডমাষ্টারের কাছে নালিশ করার সময় বলছেন, "লিখেছে যে, বাল্যকালেই যদি এইভাবে পরের ইস্পি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয় তাহলে এই বয়সেই ওর চরিত্র ভয়ানক ক্ষণভঙ্গুর হয়ে যাবে।" কিশোরদের জন্য লেখা বইয়ে এই Pun-প্রচেষ্টা সাংঘাতিক নয় কি?

এরপরের চুটকি, "আস্তে আস্তে ভাঙতে হয়"। এতে বাজি ধরে ব্রিজ খেলার কথা আছে। "বেজায় রকম হারছে সিধু—হেরে হেরে ঢোল হচ্ছে। মাসকাবারের মাইনে প্রায় কাবার। সিধু বলছে, যে-মাটিতে পড়ে, লোকে ওঠে তাই ধরে। যে খেলায় টাকাগুলো মাটি হলো, তার থেকেই টাকাগুলো তুলতে হবে। টাকা মাটি—মাটি টাকা। বারবার বলছে সে, মস্তপুরুষের

মতই বলছে।.....জামার সঙ্গে সোনার বোতাম রয়েছে। হাতঘড়িটাও আছে তার। ফাউন্টেন পেনও যেন ছিল...কিন্তু ফিরে গিয়ে দেখতে পাবো কিনা বলতে পারিনা।" শুধু জুয়াখেলার কথা নয়, 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' কেও টেনে এনেছেন লেখক।

"জাহাজ ধরা সহজ নয়" গল্পে স্বপ্নে দিদি জলে পড়ে গেছেন। শালা বোনাইকে সেই কথা গান করে বলছে ঃ

মরি হায়রে!
তোমার যে বৌ—আমার যে বোন—
বলতে বেদনা জাগে।
জলে পড়ে গেছেন তিনি
মাইল তিনেক আগে—
মরি হায়রে!!

কিশোরদের বইতে এমন কবিতা কেমন মানায় সেটা ভাবনার কথা। কিশোরদের কাছে কী ধরণের লেখা পরিবেশন করতে হবে তার দায়িত্ব প্রকাশকেরও।

নেমন্তন্ন লাভ, চশমখোর, বাঁমানুষিক ব্যবহার, আমাদের ভালো লেগেছে। রেবতীভূষণের রেখা বইটির আকর্ষণ।

দ্বিতীয় বই "বোরোবুদুরের ডাক"এ লেখিকা ইন্দিরা দেবী দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন এবং ভারতবাসীর বা বাঙালীর এক গর্বময় ইতিহাসের সঙ্গে কিশোরদের পরিচয় দেওয়ার সৎপ্রচেষ্টা করেছেন, একটা ভূমিকা থাকলে ভালো হত, বোরোবুদুর সম্বন্ধে। একটা ফটোও, হাতে আঁকা ছবি নয়। যবদ্বীপের ভাষায় লেখা যে-বৌদ্ধগ্রন্থ উদ্ধার করলো সৌম্য, তা কাল্পনিক না ঐতিহাসিক সত্য, এ-সম্বন্ধে কিশোরদের স্পষ্ট করে বলা দরকার। দাশরথি পালের প্রচ্ছদশিল্প প্রশংসনীয়।

**নীলকণ্ঠ ঃ—** রাম বসু। প্রকাশক ঃ গ্রন্থজগৎ কলিকাতা-১২ দাম দেড় টাকা ॥

সাধারণভাবে নাটক বলতে যা বোঝায় 'নীলকণ্ঠ' তা নয়। অথচ নীলকণ্ঠ নাটক,— প্রতীক নাটক। জীবনের পূর্ণতার প্রতীক,— অবিচ্ছিন্ন পূর্ণতা, শেখর ও অরুণার জীবনে যেটির অভাব। এই যন্ত্রণার ছবিটি চমৎকারভাবে শেখর-অরুণার কাব্যিক সংলাপের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি রাম বসু। 'কবিতামেলায় এর অভিনয় দেখিনি। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে রঙ্গমঞ্চের অভিনয়সাফল্যই এ-ধরণের নাটকের রসোত্তীর্ণতার পরিচয় নয়। রাম বসুর কবিখ্যাতি আছে, নীলকণ্ঠে সে-খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হয়নি। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদ মনোরম।

**সরিৎশেখর মজুমদার**